লোকশিল্প

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

লোকশিল্প

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১

আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির শক্তি ও সম্ভাবনা
আবহমান বাংলার লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যে নিহিত

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

লোকশিল্প

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ প্রতিবেদন

Folk Art & Crafts Fair and Festival 2001 Report

সম্পাদক

সৈয়দ মাহবুব আলম

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

সহকারী সম্পাদক

বিশ্বনাথ সরকার

গবেষণা অফিসার

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

মোঃ রবিউল ইসলাম

সংরক্ষণ অফিসার

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

প্রচ্ছদ

জসিম উদ্দিন

ফটোগ্রাফী

শফিকুর রহমান

ফটোগ্রাফার

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, জুন ৩০, ২০০১

মুদ্রণে

এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস

৪৩/১০ সি, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৯৫৫৪৬১৩, ৭১২০৪২৮

মূল্য

একশত টাকা মাত্র

Folk Art & Crafts Fair and Festival 2001 Report Edited by Syed Mahbub Alam, Director, Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation. Published by Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation. Sonargaon, Narayangonj, Bangladesh. First Edition: 30 June 2001, Price: Tk. 100.00

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ৪

২. লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ এর আলোকচিত্র পৃষ্ঠা ৫

৩. লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ পৃষ্ঠা ১৩

৪. ঢাকাই জামদানী শাড়ীর নক্সা বৈচিত্র্য—মালেকা খান পৃষ্ঠা ১৭

৫. লোক কারুশিল্প ঃ বাণিজ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন—আবু তাহের খান পৃষ্ঠা ২৯

৬. টাংগাইল শাড়ীর ঐতিহ্য ও রূপ বৈচিত্র্য—সুকুমার বসাক পৃষ্ঠা ৩৫

৭. লোকজ গীতিনৃত্য প্রসংগ আলকাপ—বিশ্বনাথ সরকার পৃষ্ঠা ৩৯

৮. বাংলাদেশের মেলার সাজসজ্জা ঃ ঐতিহ্য ও রূপান্তর—জসিমউদ্দিন পৃষ্ঠা ৪৭

৯. রংপুরের শতরঞ্জি বাংলার নিজস্ব এক কারুশিল্প এবং এর ভবিষ্যৎ—মোঃ রবিউল ইসলাম পৃষ্ঠা ৫২

১০. লোকজ খেলাধূলার সমাজতত্ত্ব—মোঃ খলিলুর রহমান পৃষ্ঠা ৬২

সম্পাদকীয়

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১

লোকজ উৎসব ও মেলা আয়োজন আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক উপাদান। আবহমান বাংলার লৌকিক সমাজের সামাজিক প্রথা হিসেবে লোকজ উৎসব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পথ ধরে আজ অবধি বাংলাদেশের গ্রাম-গুলোতে আয়োজন করা হয় লোকজ উৎসব ও মেলা। এই উৎসব ও মেলা কেবল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদানই নয় বরং এটি সাংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিবেশও বটে। ঐতিহ্যের ক্রমপুঞ্জিত ধারায় লোক জীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উৎসব, মেলায় গ্রামের সাধারণ মানুষের আনন্দকে উপলক্ষ করে একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। লোকজীবন ধারায় প্রথা হিসেবে লোকজ উৎসব, মেলা লোক সংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক উপাদান সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আজ অবধি সক্রিয়, প্রবহমান এবং অব্যাহত।

প্রতিবছরের মত এবছরও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন করেছে। ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সে গ্রামীণ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের লোকজ মঞ্চে গত ফ্রেব্রুয়ারি ৩ থেকে মার্চ ৩, ২০০১ পর্যন্ত মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবে প্রায় সাতহাজার (লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, ও বাদ্যযন্ত্র শিল্পীও লোককারুশিল্পী) শিল্পী অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অর্থাৎ রাজশাহী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রংপুর, মাগুরা, নওগাঁ, মুন্সীগঞ্জ, শেরপুর, এবং নরসিংদী থেকে মোট ২২ জন লোক কারুশিল্পী 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ১৮২টি ষ্টলে বিভিন্ন কারুপণ্যের মেলা বসেছিল। লোকশিল্পের ৬টি বিষয়ের উপর সেমিনার হয়েছিল। লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ এ প্রতিদিন গড়ে আনুমানিক ১০,০০০ দর্শনার্থী এসেছেন। ১৮২টি ষ্টলে প্রায় দুই কোটি টাকা বিক্রি হয়েছে।

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ এর নানা তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হল। এ বছর সেমিনারে পঠিত ৬টি প্রবন্ধ ও ইতিপূর্বে ফাউন্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে পঠিত একটি প্রবন্ধ 'রংপুরের শতরঞ্জি বাংলার নিজস্ব এক কারুশিল্প এবং এর ভবিষ্যৎ' এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই প্রকাশনাটি গৃহীত হবে বলে আশা রাখি।

সৈয়দ মাহবুব আলম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

লোকজ উৎসব ২০০১ উপলক্ষ্যে সজ্জিত ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণ

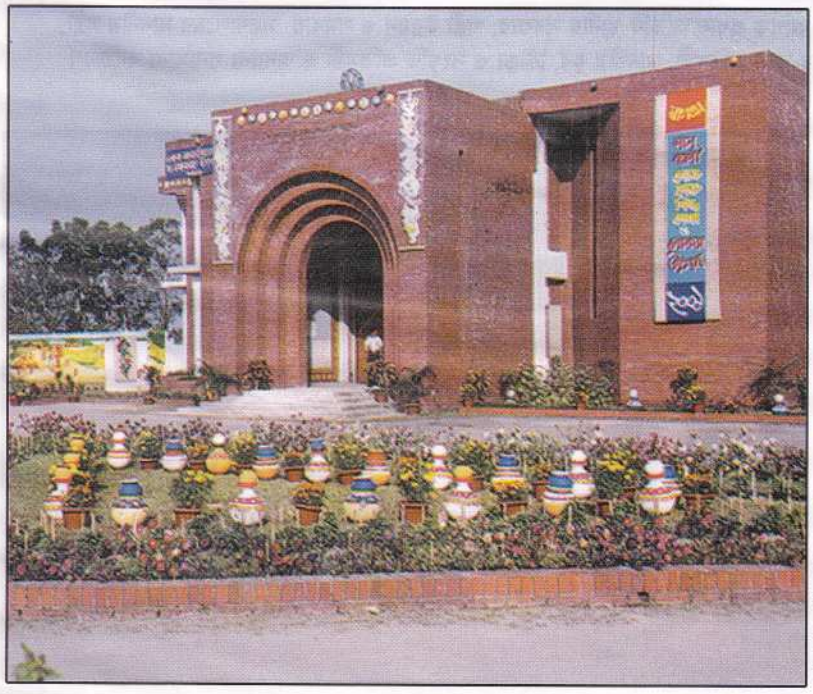

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ উপলক্ষ্যে সজ্জিত ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবন ও ভবন সংলগ্ন স্থান

শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, বিশেষ অতিথি মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

মাননীয় প্রধান অতিথি লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন

মাসব্যাপী লোকজ উৎসব ২০০১ উপলক্ষ্যে লোকমঞ্চে বাউলগান পরিবেশন করছেন বাউলশিল্পী কাঙ্গালীনি সুফিয়া

গ্রামীণ খেলা প্রদর্শনীতে স্কুলের মেয়েদের গ্রামীণ খেলা প্রদর্শন

কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে কাঠের নক্‌শা কারুকার্য শিল্পী আঃ আউয়াল মোল্লা

মাস ব্যাপী মেলায় কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে সোনারগাঁয়ের এক কাঠের পুতুল তৈরী করছেন প্রখ্যাত কারুশিল্পী মনীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর

মেলায় কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে রংপুরের শতরঞ্চি তৈরী করছেন শিল্পী রমজান আলী ও তার স্ত্রী

নওগাঁ, আত্রাইয়ের কর্মরত মুখোশ শিল্পী নয়ন মালাকার

শেরপুরের পাখার কারুশিল্পী মোঃ সাদা মিঞা তার শিষ্য

মাগুরার শোলার কারুশিল্পী
অমল মালাকার ও নিমাই
মালাকার

বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিশেষ প্রর্দশনীর দৃশ্য

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী তালপাতার পাখার শিল্পী সুলতান আহমেদ ও আবুল কালাম আজাদ

সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য পরিবেশন করছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সৈয়দ মাহবুব আলম

"গ্রামীণ খেলাধুলার সমাজতত্ত্ব" শীর্ষক সেসিনারে আলোচনা করছেন ফাউন্ডেশনের গবেষণা কর্মকর্তা বিশ্বনাথ সরকার

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১

বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি লোক কারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে নিয়োজিত বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন ১৫০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে শাশ্বত লোকজ পরিবেশে গত ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছর লোক মেলার আয়োজন করে আসছে। প্রথমে এটি ১দিনের মেলা ছিল ১৯৯২ সাল থেকে এই মেলা সপ্তাহে ২দিন করে মাসব্যাপী, সপ্তাহ ব্যাপী এভাবে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত মেলা অব্যাহত থাকে। এরপর ১৯৯৫ সাল থেকে ফাউন্ডেশন মাসব্যাপী নিয়মিত লোক কারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব-এর আয়োজন করে আসছে। এবছরও বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন গত ফেব্রুয়ারি ৩ থেকে মার্চ ৩, ২০০১ পর্যন্ত মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১ এর আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জনাব জিল্লুর রহমান এই মাসব্যাপী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ চৌধুরী, মাননীয় যুব, ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এ, কে, এম শামীম ওসমানসহ দেশের বরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেলার সাজসজ্জা

বাংলার শাশ্বত লোকজ পরিবেশে মেলা আয়োজন এই মেলার একটি অন্যতম আকর্ষণ। ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই মেলাকে প্রতি বছরই নানা রূপে নতুন আঙ্গিকে শৈল্পিক সাজসজ্জায় উপস্থাপন করা হয়। এবছরও মেলা উপলক্ষে ফাউণ্ডেশনের বিশাল চত্বরের সর্বত্রই ছিল শৈল্পিক স্থাপনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী লোকজ ঐতিহ্যের সংগে সংগতি রেখে মেলার প্রবেশ তোরণ থেকে কারুপল্লী পর্যন্ত সাজসজ্জার কাজ করা হয়। প্রবেশপথে তোরণটি করা হয় বাংলার চিরন্তন ছনের দো-চালা ঘরের আদলে দু'টি ঘর নির্মাণ করে। এই ঘরের বেড়ায় আকর্ষণীয় বেতের নক্শা তোলা হয়। প্রবেশ তোরণ

থেকে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত সাজসজ্জায় ছিল কারুময় বর্ণাঢ্য ফেষ্টুন। কিছু ফেস্টুনে ছিল লোক ঐতিহ্যের বিষয়ে বিভিন্ন শ্লোগানও উপদেশাবলী যা থেকে মেলায় আগত দর্শকগণ সংশ্লিস্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা নিতে পেরেছে। এছাড়া কিছু কিছু ফেষ্টুনে আলপনা ও লোকজ চিত্র শোভা পায়। প্রশাসনিক ভবনে একটি সুবিশাল ব্যানারে লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজউৎসব ২০০১ লেখা প্রদর্শিত হয়। এছাড়া প্রশাসনিক ভবনে আলপনা অংকিত ব্যানার, ফেস্টুন, এবং ঐহিত্যবাহী মৃৎপাত্রে বিভিন্ন গ্রামীণ নক্শা অংকিত চিত্র প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত প্রশাসনিক ভবনটিকে নান্দনিক ভাবে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়।

মেলার সাজসজ্জার অন্যতম আরেকটি আকর্ষণীয় স্থান ছিল প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন দেয়ালে এবং লাইব্রেরীর সামনে দুই পার্শ্বের দেয়ালে গ্রামীণ জীবন ভিত্তিক অংকিত বিশাল মূর্য্যাল চিত্রটি যা মেলার পরিবেশকে আরও উৎসব মূখর করে তোলে। এছাড়া নির্মিয়মান ডকুমেন্টেশন ভবনের বিপরিত দিকে ৫টি প্লাট ফরমে ১৬ × ১০ সাইজের বিশাল ক্যানভাসে গ্রামীণজীবনের ৫টি চিত্র কর্ম; যথা: পন্ডিতের পাঠশালা, বিয়ের দৃশ্য, নবান্নের উৎসব ও ফুলের মালা, ডালা সাজানো যেখানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরিবেশনায় গ্রামীণ লোকজীবনের পরিবেশ প্রদর্শিত হয়।

এ মেলার অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপনাটি ছিল লোকজ মঞ্চ। গ্রামীণ প্রচলিত প্রযুক্তির মাধ্যমে ফাউণ্ডেশনের পরিচালকের পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে সাতচালা বিশিষ্ট ছনের লোকজ মঞ্চটি নির্মাণ করা হয়। এই মঞ্চটির ভেতরের অংশে বেতের কারুকাজ করে আরও আকর্ষণীয় করা হয়। এই মঞ্চটি প্রায় ১০০ জন অভিজ্ঞ শ্রমিক দীর্ঘ একমাস কাজ করে মঞ্চের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে। গ্রামীণ ঘরবাড়ীর অবকাঠামোর অনুরূপভাবে তৈরি মঞ্চটি দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এছাড়া ফাউণ্ডেশনের সর্বত্র যেমন মেলার মাঠ, খেলার মাঠ, কারুপল্লীসহ সকল স্থানে ব্যানার ফেস্টুন ও লোকজ চিত্রকর্ম ও অন্যান্য স্থাপনাদিয়ে মনোরমভাবে সাজানো হয়। ফাউন্ডেশনের সকল স্থানে সুসজ্জিত করে টবে বিভিন্ন রঙের ফুলের গাছ দিয়ে সমগ্র স্থানটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের পরশ দেয়া হয়। ফলে সমগ্র ফাউণ্ডেশনটি প্রাকৃতিক রূপে শোভাবর্ধন করে।

মেলার অনুষ্ঠানাদি

গানের দেশ প্রাণের দেশ বাংলাদেশ। যেখানে রয়েছে জারী, সারী, ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি মারফতি, লালনগীতি, হাসন রাজার মত লোকসংগীতের ভান্ডার। লোকসংগীতে সমৃদ্ধ ভান্ডার থেকে ফাউন্ডেশনের লোক মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাসব্যাপী বাউলগান, মাইজভান্ডারী গান, হাছন রাজার গান, লালন গীতি, কবিগান, আলকাপগান, গম্ভীরা গান, জারীগান, সারীগান, ভাওয়াইয়া–ভাটিয়ালী গান, গীতি নাট্য যাত্রা, গল্প বলা, উপজাতীয় সংগীতসহ নানা ধরণের লোকজ গান পরিবেশিত হয়। প্রায় ৭০০০ সাত হাজার লোকজ সংগীত শিল্পী লোকজ নৃত্য শিল্পী ও লোকজ বাদ্যযন্ত্রী এসকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাসহ মাঠে ১৫টি স্কুলের প্রায় .১৫০০ জন ছেলেমেয়ে গ্রামীণ খেলা প্রায় প্রতিদিন পরিবেশন করে। এছাড়াও বিভিন্ন লোকজ খেলা যেমন, পানিতে হাঁসধরা, দোক খেলা, হা-ডু-ডু খেলা, দারিয়াবান্দা ইত্যাদি খেলাও পরিবেশিত হয়।

কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনী

হারানো ঐতিহ্যকে পুনরায় আবিস্কার করা, অজানা কারুশিল্প ও শিল্পীকে লোক সম্মুখে তুলেধরা, কৃতিকারুশিল্পীদের কাজের প্রেরণা যোগানো, কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা

ফাউন্ডেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে প্রতিবছর ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গনে আয়োজিত মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অজানা দক্ষ কারুশিল্পীর শিল্পকে "কর্মরত কারুশিল্পী" প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এবছরও "কর্মরত কারুশিল্পী" প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ১১ শ্রেণীর মোট ২২ জন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারুশিল্পী তাদের কারুপণ্য নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে। যথাঃ

(১) জনাব আঃ আউয়াল মোল্লা সোনার গাঁ,- নিপুনকাঠ খোদাই কারুশিল্পী। (২) মনিন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর-সোনারগাঁয়ে কাঠের হাতি, ঘোড়া পুতুল। (৩) শ্রীরতন চন্দ্র সূত্রধর-কাঠখোদাই কারুশিল্প, সোনারগাঁও (৪) মোঃ শাহজাহান-হাতপাখা, চট্টগ্রাম, (৬) জনাব আবুল কালাম হাতপাখা চট্টগ্রাম (৭) মোসাঃ আলেয়া বেগম রীনা-পাটি শিল্পী, মিরেশ্বরাই (৮) মোঃ খায়রুল আলম, পাটিশিল্পী, মিরেশ্বরাই (৮) মোঃ রমজান আলী-সতরঞ্চি, রংপুর (১০) মোসাঃ রোজিনা খাতুন সতরঞ্চি, রংপুর (১১) সুশান্ত কুমার পাল-রাজশাহীর সখের হাড়ি, রাজশাহী (১২) শ্রী সঞ্চয় কুমার পাল-রাজশাহীর সখের হাড়ি, রাজশাহী (১৩) শ্রী শংকর মালাকার-শোলার কারুশিল্পী, মাগুরা, (১৪) শ্রী অমল মালাকার, শোলার কারুশিল্পী মাগুরা, (১৫) শ্রী নয়ন চন্দ্র মালাকার-মুখোশ শিল্পী, আত্রাই, নওগাঁ (১৬) নিমাই মালাকার,- মুখোশ শিল্পী আত্রাই, নওগা (১৭) রঘুনাত লক্ষ্মীসরা, রংপুর (১৮) তুষার আচার্য্য-লক্ষ্মীসরা মুন্সিগঞ্জ (১৯) মোঃ সাদা মিয়া-হাতপাখা শেরপুর, (২০) বিপুল মিয়া কাপড়ের হাতপাখা-শেরপুর (২১) ছালেহা বেগম-শিকাশিল্পী নরসিংদী (২২) রীনা বেগম শিকাশিল্পী, নরসিংদী। এই সমস্ত কারুশিল্পী মাসব্যাপী মেলায় কারুপণ্য উৎপাদন প্রদর্শন এবং বিক্রয় করে।

মেলার ষ্টল

এবারের মেলায় নানা প্রকার দ্রব্যাদির সর্বমোট ১৮২টি ষ্টল বসে। এসকল ষ্টলের মধ্যে (১) হস্তশিল্পের ষ্টল ছিল ৭৬টি, (২) ষ্টেশনারী মনোহরী, বই ও ফুলের ষ্টল-৫৪টি, (৩) হরেক রকমের মিষ্টি সজ্জিত মিষ্টি দোকান-৩৪টি, (৪) খাবার দোকান-১৮টি এবং অন্যান্য দোকান ছিল-৯টি। ষ্টলসহ কারুপল্লী আরও ২৮ ষ্টলে মাসব্যাপী মেলায় কেনাবেচা হয় অনুমানিক ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকার।

বিশেষ প্রদর্শনী

মনোরমভাবে সজ্জিত বিশেষ প্রদর্শনী স্থানে লোক শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এইসব প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল নক্শী কাঁথা, বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন উপকরণের হাতপাখা, নানা প্রকারে মৃৎপাত্র, চট্টগ্রামের পাটি, রংপুরের সতরঞ্চী, বিভিন্ন প্রকারের পাটের শিকা, লক্ষ্মীসরা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈয়ের হাঁড়ি, কাঠ খোদাই কারুশিল্প এবং ফাউণ্ডেশনের কর্মকাণ্ডের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

মেলা উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ

স্কুল ছেলে-মেয়েদের গ্রামীণ খেলাধূলা, নির্ধারিত প্লাটফরমে আবহমান লোক জীবনের পরিচিত দৃশ্যবলীর প্রদর্শন অর্থাৎ লোকজীবন প্রদর্শনী, রাধাচক্র, শিশুদের ঘোড়ায় চড়া, দোলনায় চড়া, নৌকা ভ্রমন ইত্যাদি ছিল মেলার বিশেষ আকর্ষণ।

সেমিনার অনুষ্ঠান

ফাউন্ডেশনের লোক কারুশিল্প মেলাও লোকজ উৎসবের আরও একটি অন্যতম বেশিষ্ট্য হলো সেমিনার অনুষ্ঠান। ১৯৯৫ সাল থেকে সেমিনার অনুষ্ঠানকে লোকজ উৎসবের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকজ বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের বিশিষ্ট গবেষকগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন লোক সংগীত, গ্রামীণ খেলাধূলা, লোকবাহন, মৃৎশিল্প, জামদানী, শোলা, তামা-কাঁসা-রূপা অলংকার ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠান হয়েছে। এ বছরও ৬টি বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হলোঃ

১। **ঢাকাই জামদানী শাড়ীর নক্‌শা বৈচিত্র্যঃ-** প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট লোককারুশিল্পবিদ মিসেস মালেকা খান, আলোচক ছিলেন সুজিত কুমার প্রামানিক ও সৈয়দ মাহবুব আলম। সভাপতিত্ব করেন স্থপতি জনাব আঃ সালাম।

২। **লোক ও কারুশিল্পঃ বাণিজ্য ও সংস্কৃতির মেল বন্ধন** প্রবন্ধকার ছিলেন বিসিকের উপমহা-ব্যবস্থাপক জনাব আবু তাহের খান, আলোচক ছিলেন- মিসেস সুফিয়া খাতুন ও জনাব বিশ্বনাথ সরকার, সভাপতি ছিলেন-মিসেস মালেকা খান।

৩। **লোকজ খেলাধূলার সমাজতত্ত্বঃ** প্রবন্ধকার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, আলোচক ছিলেন জনাব বিশ্বনাথ সরকার ও সভাপতিত্ব করেন- জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ পাঠান।

৪। **টাঙ্গাইল শাড়ীর ঐতিহ্য ও রূপ বৈচিত্র্য ঃ** ৪র্থ সেমিনারটি ছিল টাঙ্গাইল শাড়ীর ঐতিহ্য ও রূপ বৈচিত্র্য। শিরোনামের প্রবন্ধকার ছিলেন সুকুমার বসাক, টাঙ্গাইল শাড়ী তৈরী শিল্পী। আলোচনা করেন ডঃ সহিদুল ইসলাম এবং কাজী আবু সাঈদ, সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সৈয়দ মাহবুব আলম।

৫। **লোকজ গীতিনৃত্য প্রসংগ আলকাপঃ** পঞ্চম সেমিনার জনাব বিশ্বনাথ সরকারের "লোকজ গীতিনৃত্য প্রসংগ আলকাপ শিরোনামে। আলোচনা করেন জনাব আব্দুল আওয়াল, উপ-পরিচালক বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও মিসেস রোকেয়া সুলতানা রাকা। সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মাহবুব আলম।

৬। **বাংলাদেশের মেলার সাজসজ্জা বৈচিত্র্য ও রূপান্তর ঃ** সেমিনার অনুষ্ঠানের সর্বশেষ সেমিনারটি ছিল-বাংলাদেশের মেলার সাজসজ্জা বৈচিত্র্য ও রূপান্তর- প্রবন্ধকার শিল্পী জসিম উদ্দিন এবং আলোচক ছিলেন মোঃ রবিউল ইসলাম ও মোঃ খলিলুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন - সৈয়দ মাহবুব আলম।

মাসব্যাপী মেলায় প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতিদিন সন্ধা ৫ টা থেকে লোকজ অনুষ্ঠান দেখার জন্য আনুমানিক গড়ে ১০,০০০হাজার লোকসমাগম হয় এবং মাসব্যাপী মেলায় আনুমানিক প্রায় ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) লোক সমাগম হয়। এছাড়া অনেক বিদেশী দর্শক, কূটনীতিক, মেলা পরিদর্শন করেন। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিক, বিটিভি, ইটিভির সাংবাদিকগণ মেলা পরিদর্শন ও মেলার উপর সংবাদ পরিবেশন করেন।

ঢাকাই জামদানী শাড়ীর নক্সা বৈচিত্র্য

মালেকা খান

ভূমিকা

শাড়ীর জগতে মনকারা নক্সার জন্য ঢাকাই জামদানী শাড়ী আপন মহিমায় শীর্ষ স্থান করে নিয়েছে। কোথায় তার সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তা জানতে হলে আমাদের একটু ফিরে যেতে হবে সুদূর অতীতের কাছে।

বাংলার ঐতিহ্য ঢাকাই মসলিনের ছিল নানা ধরণের বাহারী নাম। যেমন শবনম, তানজেব, নয়নসুখ, শরবন্ধ, আলবেলী, মলমল খাস, দেওয়ান-ই-আব, সরকার-ই-আলী, ধবল, জামদানী এমনি হরেক রকমের নাম ছিল ঢাকার বিশ্বনন্দিত তাঁত বস্ত্র মসলিনের। মসলিন মূলতঃ ছিল পাঁচ প্রকারের।

প্রথম ঃ আদ্দি বা মলমল মসলিন (প্লেইন)

দ্বিতীয় ঃ ডুরে বা ডোরিয়া মসলিন (স্ট্রাইপ)

তৃতীয় ঃ চারকোনা বা চারখান মসলিন (চেক)

চতুর্থ ঃ কাসিদা ও চিকন মসলিন (সূচীকাজ)

পঞ্চম ঃ জামদানী মসলিন (বুননের মাধ্যমে গোটা শাড়ী জুড়ে ফুল তোলা। স্থানীয় নাম পডি নক্সা বোনা) ঢাকাই মসলিন জামদানীর পরিচিতি।

মসলিন শেষ হয়েও হয়নি শেষ WOVEN AIR OF DHAKA এই পরিচয়ে ঢাকাই মসলিন যাদুঘরে অম্লান বদনে ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবে এখনো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার কয়েকটি গ্রামের তাঁতীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও একাগ্রতার ফলে জামদানী বা পডি নক্সায় বোনা শাড়ী আনন্দ উৎসবের মাঝে ব্যাতিক্রম পরিধেয় বস্ত্রের মর্যাদা নিয়ে আজো বেঁচে আছে। এখন যদিও অতীতের সেই নরম তূলা পাওয়া যায় না বলে কাটুনীরাও তৈরী করেনা সুক্ষ্ম মিহি সূতা আর শানাকাররা তৈরী করেনা মিহি বাঁশের

শানা তবুও উল্লিখিত এলাকার বয়নশিল্পীরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে খুবই আন্তরিকভাবে বংশপরম্পরায় বুনে যাচ্ছে মসলিন জামদানী আর সৃষ্টি করছে নয়নকারা বাহারী জামদানী নক্সা। বাজার থেকে যখন যেমন কাউন্টের সূতা পাচ্ছে তাই দিয়ে বুনে চলছে হাজারো রকমের নক্সার কাপড়। তারা মসলিনের পঞ্চম কন্যা মসলিন জামদানীকে পরম মমতা দিয়ে নিরবে নিভৃতে নিঃশব্দে আজো বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই বয়নশিল্পীগণ বুননের মাধ্যমে নক্সা তোলার কাজে অত্যন্ত দক্ষ ও নিপুণ এবং পটিয়ান ছিলেন। হাতে কাটা দুশো থেকে তিনশত কাউন্টের সুক্ষ্ম সূতা দিয়ে মসলিনে পটি পটি বাহারী নক্সা বুনতেন বয়নশিল্পীগণ।

সর্বোৎকৃষ্ট নিপুণ মসলিন জামদানী বুনন নক্সা কাজকে আঞ্চলিক ভাষায় পডি কাজ বলা হয়। পটু বা পাটি শব্দ থেকে আঞ্চলিক ভাষায় পডি কথাটি এসেছে বলে অনুমান করা যায়। (গ্রামে সুন্দর ও নিপুণ বা পরিপাটি করে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় পটি বা পডি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে) যারা এই ঢাকাই জামাদানী বয়ন শিল্পের সাথে জড়িত তাদেরকে বলা হয় পডিদার। যে ঘরে বসে তাতে বোনা হয় সেই ঘরকে বলা হয় পডিঘর। যে ঘরে বসে পণ্যের যাচাই করা হয় ও ফড়িয়াদের কাছে দাম দর ঠিক করা ও বিক্রী করা হয় সেই ঘরকে পডির বাংলা ঘর বলা হয়। ঢাকা জেলার এই অনন্য বয়ন শিল্প সাধারণভাবে ঢাকাই শাড়ী নামে খ্যাত।

যে সব এলাকায় জামদানী নক্সার শাড়ী বোনা হয়-

সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়নের ৫টি গ্রাম	ঃ	আটি, আজিবপুর, শিমরাইল, কলাবাগ, ও ব্যাপারীপাড়া।
তারাবো ইউনিয়নের ৮টি গ্রাম	ঃ	তারাবো, নোয়াপাড়া. দক্ষিণ রূপসী, উত্তর রূপসী, গন্দ্রবপুর, পুব গাও, খালপাড় ও বান্ডী।
সাদিপুর ইউনিয়নের ৬টি গ্রাম	ঃ	কাজীপাড়া, বারগাও, বেহুর, বরাবো, মোগরাকুল, পবনকুল ও মইকুলি।
জামপুর ইউনিয়নের ৩টি গ্রাম	ঃ	জামপুর, নোয়াপুর, আন্দারমানিক ও সোনারগাও।

তাঁতের ধরণ প্রকার

জামদানী নক্সার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষভাবে তৈরী গর্ত তাঁতের (পিটুলুম)।

মেয়েরা পডি ঘর লেপে পুছে সুন্দর পরিবেশ তৈরীর পাশাপাশি বয়ন কাজেও ইদানিং নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। নারী পুরুষ দুয়ে মিলে মসলিনের পঞ্চম কন্যাকে লালন করছে শীতলক্ষার পাড়ের গ্রাম গুলোতে।

বর্তমানে বাজারে সুক্ষ্ম মিহি সূতা পাওয়া না গেলেও আশি বা একশত কাউন্টের সূতা পাওয়া যায়। এই সব সূতা দিয়ে পডির শিল্পীগণ তৈরী করেন মনকাড়া বাহারী ঢাকাই শাড়ী।

বয়ন কৌশল অটুট রেখে জামদানী মসলিন এখনো বিষ্ময়কর বয়ন শিল্প হিসেবে বেঁচে আছে। মসলিন জামদানী বয়ন শিল্পীগণ মুখে মুখে বুলির মাধ্যমে নির্ভেজাল অকৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে বিষ্কয়কর জামদানী নকশাগুলোকে। আর তারই মাঝে বেঁচে আছে বিশ্বনন্দিত মসলিনের ইতিহাসের ধারা। নক্সার আভিজাত্যে গরীয়ান শীতলক্ষার পানি আর সোনার গাঁয়ের আবহাওয়ায় আজও বেঁচে আছে জামদানী মসলিন বা মসলিন জামদানী তার আট পৌড়ে নাম ঢাকাই শাড়ী।

পডি তাঁতে জামদানী নক্সার বৈশিষ্ট

বয়ন শিল্পীগণ উজ্জ্বল রংয়ের সূতা নক্সার জন্য ব্যবহার করতে খুব পছন্দ করেন। বয়ন শিল্পীগণ মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা রংয়ের সূতা দিয়ে বাহারী নক্সা তাঁতে কাপড় বোনার সময়ই শাড়ী বা ওড়না তে বুনে ফেলেন। এর জন্য তারা বাড়তি কোন প্রকার সরঞ্জাম ব্যবহার করেন না। মনে মনে আগে থেকেই একটা নক্সা এঁকে ফেলেন সেই সাথে রংটাও ঠিক করে নেন। সেইমত সূতা রং করিয়ে নেন। তারপর তাঁতে বসে বয়ন শিল্পীর হাতে যতক্ষণ কান্ডাগুড় নামে ছোট্ট যন্ত্রটি থাকে ততক্ষণ তার মাথায় নক্সা তোলার হিসাবটা চলতেই থাকবে। আবার এই একটি নক্সাকে কেন্দ্র করে তাঁতী, কারিগর ও সাউদগণ কয়েকটি নক্সার ছবি মনে মনে এঁকে ফেলেন। এই ভাবে একের পর এক নক্সা সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। এই নক্সা তোলাটা আবার কখনো গোটা শাড়ীতে বা ওড়নাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুল, লতা-পাতা বা নানান আকৃতির বুটি ভেতরে দেওয়া হয় কিংবা আড়াআড়ি একপাড় থেকে অপর পাড় পর্যন্ত লতানো বা নানান ধরণের রেখানক্সা দিয়ে ভরা হয় অথবা জালের মত রেখাগুলো জড়াজড়ি করে বিচিত্র নক্সায় ভরিয়ে তোলে গোটা জমিনটা। বুননের মাধ্যমে তোলা সুক্ষ্ম নক্সা অতীত কাল থেকে জামদানি নক্সা হিসাবে পরিচিত পেয়ে আসছে।

জামদানী ও ঢাকাই জামদানি

জামদানি আক্ষরিক অর্থ হলো গোটা বস্ত্রে তাঁত বোনার মাধ্যমেই ফুল তোলা নক্সা। এমব্রডারি বা ব্রোকেটের কাজের চাইতেও নিখুঁতভাবে করা হয় জামদানি নক্সা। তাঁতে বোনার সময়ই বয়ন শিল্পীগন নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে বুনে বুনে একটা নকশা তোলেন। এই নক্সা বুনন কাজের জন্য দুই জন কারিগরের প্রয়োজন হয়। একটা তাঁতে ডান দিকে বসেন ওস্তাদ (মূল কারিগর) বাঁ দিকে বসেন তার সাগরেদ (সহযোগী)। ওস্তাদ যে বোল (নির্দেশ) বলেন সাগরেদ সেই বোল অনুযায়ী বোনেন। এমনি করে ধীরে ধীরে একদিন সাগরেদ আবার ওস্তাদ হয়ে যায়। নক্সা তোলার এই বোলগুলো মুখে মুখে বলতে বলতে ছড়ার মতো হয়ে গেছে। তবে ঐ বোলের ভাষা গুলো ঢাকাই জামদানী এলাকার ওস্তাদ সাগরেদ দুজনের মধ্যেই সীমাদ্ধ রয়েছে আজো।

ঢাকা জামদানি নকসা তোলার হাতে খড়ি

মসলিন জামদানি বয়ন শিল্পীদের গৃহেই তাদের সন্তানগণ "পডি খেলা" খেলতে খেলতে খেলার ছলে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেয় পৈত্রিক পেশায় নিয়োজিত হওয়ার। মজার খেলা "পডি খেলা" জামদানিপল্লীগুলোতে ছয় সাত বছরের শিশুদের খেলা। একটি কলা গাছের কান্ডকে ডুম করে মাঝামাঝি দুফালা করা হয়। একটা ফালা নিয়ে যোগ ব্যায়ামের অন্যতম আসন পদ্মাসনে বসে দু'শিশু। মিছিমিছি তাঁত বোনে ঐ কলা গাছের ডুমে, হাত ডানে বাঁয়ে নেয়। কলাগাছের ভিতরের সুক্ষ্ম আঁশের উপর শিশুদের চোখ নিবদ্ধ থাকে। একাগ্রতা এবং সৃজনশীলতার এক অভিনব অনুশীন। যোগব্যামে বসে বলে শিশু ক্লান্ত হয় না। চিত্ত থাকে প্রফুল্ল। এই খেলা শেষ হলে বাতাসা বা গুড় খাইয়ে মিষ্টি মুখ করানো হয় সবাইকে। অতি সাধারণ একটা খেলা। এরই ভিতর লুকিয়ে আছে বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য মসলিনের পঞ্চম কন্যা জামদানি মসলিনের ইতিহাসের ধারা। দশ বার বছর বয়সে ঐ শিশু আনুষ্ঠানিক ভাবে সাগরেদ হিসেবে হাতে খড়ি নেয় ওস্তাদের কাছে। এইভাবে বেঁচে আছে মসলিন জামদানী আজো। নক্সা বোনার সাথে সূতা প্রক্রিয়াজাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূতা কাটা ও মাড় করার পদ্ধতি

পডি বা জামদানী পাড়ায় প্রতি পরিবারই সূতা কাটা বা মাড় করার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই কাজ পরিবারের মেয়েরাই করে থাকে। প্রতিটি গ্রামে আবার দশ বারো জন মহিলা রয়েছেন যারা কেবল সূতা কাটা ও মাড় করার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অতীতে সূতা কাটা মাড় করার কাজে অনেক বেশী মহিলারা সম্পৃক্ত ছিলেন। এখন তাঁতী পরিবারের সদস্যরা নানান পেশায় চলে যাওয়ায় তাঁতের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে সূতা কাটুনীদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। বর্তমানে গোটা সিদ্ধিরগঞ্জে আশি-পঁচাশি জনের বেশী সূতা কাটুনী খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্তমানে পডি বা জামদানি নক্সা শাড়ী উৎপাদনের এলাকার কথা উল্লেখ করা হলো। এ থেকে সামগ্রিক একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

সিদ্ধিরগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সাতটি গ্রাম হলো; শিরাইল, আটি, আজিবপুর, উমুরপুর, পাথুইরাপাড়া, কলাবাগান ও ব্যাপারীপাড়া। এই এলাকার উৎপাদনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

এই এলাকার এইসব গ্রাম মিলিয়ে প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৫০০ শত পডি বা জামদানি তাঁত হতে ২০০ থেকে ২৫০ পিস শাড়ী বোনা সম্ভব হয়। এর বেশী উৎপাদন করতে হলে চালু তাঁতের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। অথবা শাড়ীর মান নিম্ন মানের হতে হবে, অন্যথায় উৎপাদন বৃদ্ধি কোন ভাবেই সম্ভবপর নয়। আবার এটাও লক্ষণীয় যে, সব তাঁত একই সাথে চালু থাকে না। বর্তমানে প্রায় ৫০০ শত পডি বা জামদানি তাঁত গড়ে চালু আছে সে কথাটাই এখানে বোঝানো হলো। এর মধ্যে সুতী শাড়ীর সংখ্যা বেশী। হাফ সিল্ক শাড়ীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদিত হয়। হাফ সিল্ক বলতে টানার সূতা সিল্ক ইয়ার্ন ও পড়েন সূতা কটন ইয়ার্ণ ব্যবহার করে বোনা বোঝায়। মনে রাখতে হবে যে, পডি নক্সা বা জামদানি নক্সা সব সময়ই জামদানির জন্য বিখ্যাত।

কয়েকজন সুদক্ষ কারিগর ও সাউদের পরিচিতি দেওয়া হলো।

হাছান আলী সাউদঃ ঠিকানা আজিবপুর, কোনা পাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৮৫ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি ছিলেন পডি বা জামদানি নক্সা তোলার নিপুণ কারিগর। তার কাছে অনেক বয়নশিল্পী নক্সা তোলার দক্ষতা শিক্ষা লাভ করেছেন। তার সাত আটটি তাঁত ছিল। তিনি সুদক্ষ কারিগর দ্বারা এই তাঁতগুলো পরিচালনা করতেন। তার বাংলাঘরে অধিকাংশ সময়েই রংগীন কাপড় পাওয়া যেতো।

বর্তমান অবস্থাঃ হাছান আলী সাউদের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা আর্থিক অনটনে পড়ে যায়। দক্ষ কারিগর হওয়া সত্ত্বেও পুজির অভাবে ও জীবনযাপনের তাড়নায় বাধ্য হয়ে অন্যপেশায় চলে যায়।

নজর সাউদ
আজিবপুর

৮০ বৎসর বয়সে মারা যান। ১৫টি তাঁত ছিল তার। নিজেও ছিলেন একজন দক্ষ কারিগর। তার বাংলাঘরে খুবই সুক্ষ্ম বাইনের নক্সাখচিত কাপড় পাওয়া যেতো। তিনি সূতা কেনা-বেচাও করতেন। ভালো বিচারক বলে এলাকায় তার একটা সুখ্যাতি ছিল। তার

ছেলে কাশেম সাউদ পিতার কাছ থেকে সব ধরণের নিপুণতা ও কৌশল শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় পুজির অভাবে অনেক তাঁতই এখন বন্ধহয়ে গেছে। তবুও কাশেম সাউদ পিতার পেশা ধরে রেখেছেন। পুজির অভাবে ভালো ভাবে কাজ করতে পারছেন না। তারপরেও ভালো কাপড়ের জন্য এলাকায় কাশেম সাউদের নাম সুপরিচিত। তবে তার অন্যান্য ভাইরা এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় জীবন যাপন করছেন।

মৃতঃ আঃ খালেক সাউদ
উমুরপুর সিদ্ধিরগঞ্জ

খালেক সাউদ আজ থেকে প্রায় ১২ মাস পূর্বে মারা যান, উমুরপুর এলাকার মধ্যে এই খালেক সাউদ অতি নামকরা একজন পডির তাঁতি ও মহাজন এবং ২০/৩০টি তাঁতের মালিক ছিলেন। খালেক সাউদ খুব দক্ষ একজন কারিগর ছিলেন। তিনি ছোট কাল থেকে লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে এই পডির কাজে হাতে খড়ি নেন। দীর্ঘ জীবন

একটানা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই কাজের সাথেই ছিলেন। খালেক সাউদের সমস্ত তাঁতের শাড়িগুলো প্রতি সপ্তাহে নিউ মার্কেটের ঢাকা শাড়ী হাউজের মালিক হাজী মফিজ উদ্দিন সাহেব ক্রয় করে নিতেন। শুধু তাই নয় খালেক সাউদের নিজের বাংলার কাপড় ছাড়াও তিনি প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০/৩৫ পিছ কাপড় অন্যান্য তাঁতিদের থেকে কিনে হাজি মফিজ উদ্দিন সাহেবকে দিতেন। এক কথায় সিদ্দিরগঞ্জের ভাল সুতি কাপড়গুলো হাজি মফিজ সাহেব নিয়ে নিতেন। এমন ভাবে ব্যবসা করতে করতে খালেক সাউদ অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। এখন তার বাড়ীতে দালান ছোট একটা থাকার ঘর একটি পডির ঘর, তার ছেলে ছোহরাব মিয়া কিছু দিন এ কাজে জড়িত ছিলেন, বর্তমানে তারা কেউ এ পেশায় নাই। সকল ছেলেরাই অন্য পেশায় নিয়োজিত আছেন।

মোঃ লাল মিয়া সরকার, পিতা মৃত: ইছমাইল সরকার
গ্রামঃ আটি, সিদ্ধিরগঞ্জ

মোঃ লালমিয়া দক্ষ কারিগর জনাব আঃ আজিজ সাউদের নিকটে পডির কাজ শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজ গুনে ভাল নকশা তৈরি করিতেন। তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে নিরুদ্দেশ তখন বয়স ছিল ৭৫ বছর। তিনি নিরুদ্দেশের পূর্বে তার স্ত্রী চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। তার চার ছেলেই দক্ষ পডির কারিগর। তার চার ছেলে মোঃ মেহের আলী, মোঃ আমীর আলী, মোঃ সফর আলী, মোঃ ইমান আলী। তিনি লতপাইর, কচুরি পাইর, পদ্মফুল, আসাদ গেট, ফুল পাইর, বাইলফুল, গান্ধি পাইর ইত্যাদি ও বুটি নকশা চিরা বুটি, খিরাই বিচি, রেডক্রস, আশ্রবি বুটি, কাহাইল কাকরা, পুটি মাছ, আম আচল নক্সা বুনতেন গোলাপছড় পাড়ের জন্য তার খুব নাম ছিল।

আঃ করিম সাউদ পিতা মৃতঃ
গ্রাম ব্যাপারি পাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ

আঃ করিম সাউদ তিনি একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন তার ঐ এলাকায় ১৫/২০টি তাঁত ছিল। সে তার জন্ম থেকে এ পেশায় ছিলেন। বিগত দিন পর্যন্ত তিনি এ পেশায় থেকে কোন লাভ পায়না বিধায় কয়েক বৎসর পূর্বে তার তাঁতগুলো বন্ধ করে অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। তিনি বর্তমানে আর তাঁতের কাজে নাই তার বক্তব্য যদি

কাপড়ের বাজার ভাল থাকতো তা হলে তিনি এ কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি নিম্ন মানের জামদানি নক্সার শাড়ী দেখলে খুই বিরক্ত হন। তার অনেক আশা ছিল সরকারি কিছু সহযোগিতা পেলে উন্নত মানের জামদানী শাড়ী বুনে এ পেশা তিনি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

ফন্নু সর্দার
গ্রামঃ ব্যাপারি পাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

ফন্নু সর্দার আনুমানিক ৭০/৭২ সনে মারা যান, তার বয়স ছিল প্রায় ১১৫ বছর। ফন্নু সর্দার তার পিতার সাগরেদ নোয়াব আলী সাউদ এর কাছে পডি বোনার কাজ শিখেছিলেন এবং একজন সুদক্ষ কারিগর হিসাবে সুপরিচিতি লাভ করেন ছিলেন। ফন্নু সর্দার তার জীবদ্দশায় অনেক মৌলিক নক্সা বা ডিজাইন তৈরী করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১নং ডিজাইন বড় আম, কলকা পাড়, ২নং চাটাই পাড়, ৩ নং পোরাহাজ

পাড় আরও অনেক রকমের নিত্যনতুন নক্সা কাজ করেছেন। তিনি মৃত্যুর সময় এক ছেলে রেখে গেছেন ছেলের নাম মোঃ আলতাফ সাউদ। তার বাড়ীতে অনেক তাঁত রেখে গেছেন, তার ছেলে আলতাফ সাউদ পরিচালনা করতেন। ফন্নু সাউদ সুতি শাড়ীতে পারদর্শী ছিলেন, নিজের মন থেকে আকা বাকা অনেক ধরণের নকশা তৈরী করতেন। ফন্নু সাউদের আর একটি অবদান ছিল আদি যুগের লোকেরা নাকি লাঠি খেলতো ফন্নু সাউদ ঐ লাঠি খেলার প্রধান সর্দার ছিলেন। সর্দার নামকরণ তার এই লাঠি খেলা থেকেই হয়েছিল, শুধু তাই নয় তিনি অনেক শক্তিশালী ছিলেন বটে। ফন্নু সর্দারের বুকের উপর কাহাইল রেখে এক মন দেড় মন ধান ভানা হতো। তাকে নিয়ে এলাকায় অনেক গল্প রয়েছে।

গেদু সাউদ পিতা মৃতঃ মোহের চান সাউদ
গ্রামঃ আজিব পুর সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

গেদু সাউদ মারা গেছেন আনুমানিক ৮৪/৮৫ সালে। গেদু সাউদ ছিলেন একজন ভাল ও দক্ষ কারিগর তাঁর নিজস্ব কোন ডিজাইন ছিলনা, পূর্বের তৈরিকৃত ডিজাইনই তিনি করতেন। গেদু সাউদের এমন সময় গেছে তিনি ৬দিনে ৫টি জামদানি শাড়ি তৈরি করতে পারতেন। ভাল পরিশ্রম করার মতো লোক ছিলেন, তিনি মৃত্যুর সময় স্ত্রী, ছেলে ১জন ও মেয়ে ৪জন রেখে গেছেন। তার ছেলে আব্দুল মজিদ এখনো আছেন, সেও জামদানির জগতে ভাল সুনাম অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে মজিদ এ কাজ আর করেন না, তিনি এখন নিজে গাড়ীর ব্যবসা করছেন। এই আঃ মজিদ খুব পারদর্শী কারিগর ছিলেন, সেও ৬দিনে ৪টি জামদানি শাড়ী তৈরি করিতে পারিতেন। সে এখনো জীবিত আছেন। বাড়ীতে এখন কোন তাঁত নেই, তারা কেউ এ পেশায় নাই।

মোঃ আলতু সাউদ পিতা মৃতঃ ফন্নু সর্দার
সিদ্ধিরগঞ্জ

আলতু সাউদ মারা যান ৫৫ বছর বয়সে ১৯৮৮ সালে। আলতু সাউদ ছিলেন ফন্নু সাউদের এক মাত্র ছেলে আলতু সাউদ তার বাবার কাছে থেকে পডির কাজ শিখেছে। এই পডি বুনেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। শেষ বয়সে তিনি ঢাকায় কয়েক বৎসর ব্যবসায় রত ছিলেন, শুধু ঢাকায় নয়, আলতু সাউদ সোনার গাঁও শাড়ী দিয়েছেন। সোনার গাঁও যাদুঘরে মেলার সময় প্রতি বৎসরই এ আলতু সাউদের কাছ থেকে শাড়ী নিয়ে

যাদুঘরে সাজানো হতো। আলতু সাউদের একটি তাঁত ছিল, সোনারগাঁও যাদুঘরে মেলার সময় ঐ তাঁতটি চালু রাখতেন। আলতু সাউদ এর বৈশিষ্ট হলো তিনি এক টানা সারা জীবন জামদানী কাজের নক্সা বোনা ও উন্নয়ন কাজে জড়িত ছিলেন। তার বাড়ীতে এখনো ৮/১০টি তাঁত আছে। বর্তমানে কারিগর ও সাগরেদগন তাত বোনেন আর বেচাকেনা পরিচালনা করেন তার ভাতিজারা।

আব্দুল হাই মিয়া পিতা মৃত রজব আলী
গ্রামঃ দক্ষিণ রূপসি, রূপগঞ্জ

আঃ হাই মিয়া জানিয়েছেন গত কয়েক বৎসর পূর্বেও তিনি ৮/৯টি তাঁতের মালিক ছিলেন। আঃ হাই ভাল কারিগর এবং ভাল ব্যবসায়ি মহাজন বটে। তিনি জানিয়েছেন তিনি নিজে শাড়ী তৈরি করিতেন এবং তার কারিগর সাগরেদও বটে। তিনি জানিয়েছেন তিনি নিজে শাড়ী তৈরি করিতেন এবং তার কারিগর সাগরেদও ছিল। এর পর সে নিজে কাপড় কিনে বিক্রি করিতেন। বৎসর খানিক হয় সে ব্যবসা বন্দ করে দিয়েছেন, তাঁতগুলিও বন্দ হয়ে আছে একেতো কারিগর ও সাগরেদের অভাব, এরপর বাজারের অবস্থা ভালনা। এ ছাড়া সাধারণ তাঁতী তাঁতের জোড়ে ব্যবসায় নেমে আমাদের বাজার নষ্ট করেছেন এজন্য এই পেশা প্রায়ই বন্দ বাড়ীতে ২টি তাঁত চলে আঃ হাই জানিয়েছেন পুজির অভাব এবং ভাল ক্রেতার অভাব।

একজন ভাল তাঁতীর শাড়ী অনেক দামী হয়ে থাকে এবং তিনি নিজেই ডিজাইন করে কাজ করতে সক্ষম। ঘরে একটি তাঁত বর্তমানে এ তাঁতে সে কাজ করেন।

ইছামদ্দিন সাউদ
আটি শিমরাইল

তিনি একজন সুদক্ষ জামদানি তাঁতী তার শাড়ী জগৎ বিখ্যাত বলে পরিচিত। সারা জীবনই ছেলেকে নিয়ে কাজ করে আসছেন অন্য কোন মানুষের কাজ করেন নাই। নিজেই তার পডিতে কাজ করিতেন, এখন বয়স হয়েছে প্রায় ৬৫/৬৬ বৎসর। পডির বাজার ভাল না সপ্তাহে ৩০০ টাকার উপরে কাজ হয় না বিধায় সমস্ত তাঁতের যন্ত্রপাতি বিক্রি করে অন্য পেশায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। এলাকায় ইছামদ্দির মতো কারিগর খুবই কম আছে। ইছামদ্দিন নিজেই বলেছেন তার তৈরি শাড়ী পূর্বের মতো এখনো, সে শাড়ী তৈরি করবে, কিন্তু সে গরিব তার পুজি নাই বাজারে শাড়ীর মূল্য নাই। তিনি জানিয়েছেন উচিত মূল্য পেলে এবং ভাল পুজি পেলে সে এখনো এ কাজ করতে চায়।

আলী মাস্তান পিতা মৃতঃ শেখ এলাহি
গ্রামঃ কাজিপাড়া দক্ষিণ রূপসী রূপগঞ্জ নারায়নগঞ্জ

আলী মাস্তান ছিলেন জামদানী তাঁতে দক্ষ ও নিপুণ শিল্পী। আলী মাস্তান মৃত্যুর সময় তার ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে রেখে গেছেন। ছেলে ১) মোঃ আলী হোসেন ২) মোঃ মোক্তার হোসেন, মেয়ে ৩) শাহানাজ। আলী মাস্তান গরিব একজন ছিলেন, সহায় সম্বল হীন, মৃত্যুর পর বাড়ীতে শুধু ৫/৬ শতাংশ জায়গা রেখে গেছেন, পাকিস্তান সরকারের আমলেও আলী মাস্তানপুরে একটি প্রদর্শনী করেছিলেন, আলী মাস্তান ইন্দিরা গান্ধির শাড়ীটি তৈরি করেছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান যখন ইন্দিরা গান্ধিকে জামদানি শাড়ী উপহার দিয়েছিলেন সেই শাড়ীটি ছিল আলী মাস্তানের নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি এবং তিনি

নিজে এই শাড়িটি তৈরি করেছিলেন। এই ডিজাইন কারো দেওয়া ডিজাইন নয় বলে তার ছেলে মেয়ে ও ভাগিনারা দাবি করেছেন। আলী মাস্তান ঐ সময় হাজি কফিল উদ্দিন সাহেবের ফেক্টরীতে কাজ করিতেন বলে জানান। হাজি সাহেব অনেক আদর করিতেন দক্ষ শিল্পী হিসেবে। হাজি সাহেব আলী মাস্তানের নিজস্ব ডিজাইনের অনেক শাড়ী অনেক জায়গায় বিক্রি করে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। অনেক পত্রিকায় হাজি সাহেবের নাম এসেছে। দেশে বিদেশে সমগ্র এলাকায়। শাড়ী তৈরি করেছেন আলী মাস্তান সুনাম করেছেন হাজি কফিল উদ্দিন সাহেব। এতথ্য দিয়েছেন তার ছেলে, মেয়ে, ভাগিনারা ও পাড়ার অনেক তাঁতী সম্প্রদায়। যেমন সর্ব প্রথম আলী মাস্তানের ছেলের সাথে আমাকে অর্থাৎ ইমাম আলীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মোঃ আব্দুল হাই, পিতা মৃতঃ রজব আলী দক্ষিণ রূপসী, কাজী পাড়া। আঃ হাই সাহেব আমাকে বলেছেন হাজি কফিল উদ্দিন সাহেব আলী মাস্তানের তৈরি জামদানী শাড়ী দিয়ে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপর আলী মাস্তান তৈরি করেছেন জয় বাংলা শাড়ীতে লেখা, তৈরি করেছেন জয় ইন্দিরা গান্ধি শাড়ীতে লেখা তৈরি করেছেন নৌকা মার্কার প্রতীক জামদানী শাড়ীতে। তৈরিকৃত শাড়ী গুলো হাজী সাহেব বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন এবং অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও নিজস্ব উদ্ভাবন থেকে জামদানিতে আনেন পুই লতা পাড়, বেল পাতা পাড়, যাদুর ফুল, দুবলা পাড় আংটি জাল, শাল পাড়, কলকা পাড়, কলকা তেছরি, সাবুদানা তেছরি, বড় কলকা পাড়, আদার কানা, কলার কানা, চিনি বাসন, ভাংগা তেছরি, ইত্যাদি। সেই নিপুন দক্ষ শিল্পী আলী মাস্তান আজ আর নেই। তিনি মারা গেছেন গত ৮/৯ বছর পূর্বে তার বড় ছেলে আলী হোসেন জানিয়েছেন। আলী মাস্তানের বড় ছেলে আলী হোসেন বাড়ীতে তার ছেলেকে নিয়ে একটি তাঁতে কাজ করেন ও তার স্ত্রী নিজে একজন সাগরেদ নিয়ে এক তাঁতে কাজ করেন। তার ছোট ভাই মোক্তার হোসেন অন্য এক বাড়ী জামদানী তাঁতের কাজেই নিয়োজিতো আছেন। এ এলাকায় আরো অনেক দক্ষ কারিগর রয়েছে। তাদের সরকারি সহায়তা প্রদান করে তাদের দক্ষতাও নিপুণতাকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন, তা না হলে এ শিল্প আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জামদানী নক্সা বোনার ক্ষেত্রে ভিমার ও সুতা প্রস্তুত কারীদের ভূমিকা

তানা ওয়ালা সুতার বাজার থেকে সুতা ক্রয়করে সুতা ওয়ালিদের এ সুতা গুলি ছোট ছোট ফেটি করে ভিজিয়ে রাখেন। পানি থেকে সুতা গুলি উঠিয়ে পানি ঝড়িয়ে নেন। তারপর খই মাড় তৈরী করেন। সুতা ওয়ালি ঐ মার গুলি ভিজানো সুতায় ঘসে ঘসে দিতে থাকেন প্রত্যেকটি ফেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মার দিয়ে সুতা কাটা শুরু করেন। সুতা ওয়ালি এই সুতা নাটাতে দিয়ে মার সহকারে রৌদ্রে শুকিয়ে আবার একত্র করিয়া তানা ওয়ালির (বিমার) কাছে দিলে তানা ওয়ালা এই শুকানো সুতা দিয়ে তানার কাজ আরম্ভ করেন। তানা ওয়ালার কর্মচারি থাকে ৮/১০জন। কর্মচারিগণ ফেটিগুলি চরকিতে চড়িয়ে তানা হাটা শুরু করেন, দুই জনে মিলে তানা হেটে প্রতি দিন একটি তানা করেন অতঃপর তানা ওয়ালা ঐ তানা ভাজ করেন সানায় সূতা গাঁথেন। বর্তমানে সানা নম্বর ১৮০০, ১৯০০, ২০০০, ২২০০ হয়ে থাকে। সানা গাথা শেষ হয়ে গেলে তানা ওয়ালা তানা পেচানো আরম্ভ করেন। এর পর ভরার কাজ শুরু করেন। দুই ঝাপের তাতে এক্সটা ওয়েপট সুতা দিয়ে জামদানী বোনা হয়।

সূতা কাটার কাজ ফেটি করার কাজ শুধু মেয়েরা করেন আর তানার কাজ ছেলেরা করেন।

জামদানী তাঁত বোনার মাকু অন্যান্য মাকুর চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়।

জামদানী তাঁত তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ

জামদানী নক্সার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ ভাবে তৈরী গর্ত তাঁতের (পিটলুম)।

একটি জামদানী নক্সা তৈরীর তাঁত বানাতে প্রয়োজন হয় ৪টি বাঁশের খুটি, ২টি বাঁশের বিশকরম, ২টি বাঁশের ভাবরী এবং ২টি বাঁশ দিয়ে একত্রে একটি চৌচালা, এতেই একটি পরিপূর্ণ তাঁত হয়ে যায়। এরপর প্রয়োজন হয় তার খুচরা যন্ত্রাংশের, নরদ, দক্ষি, সানা, মাকু, মুতি, কান্ডাগোর, ইতা, মুনি ইত্যাদি। (আঞ্চলিক ভাষায়) জামদানী তাঁতের নরদ হবে লোহা বা কাঠের দক্তি ও তাই লোহা না পেলে গর্জন হতে হবে। জামদানীর আক্ষরিক অর্থ দিয়ে এর অন্তনিহিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কান্ডাগুর নামের ছোট্ট একটা কাঠির মাধ্যমে সারা জমিনে বয়ন শিল্পী তার মনের মাধূরী মিশিয়ে নয়ন ভূলানো রকমারি নক্সা বুনে থাকেন।

জামদানী নক্সার প্রকারভেদঃ ঢাকাই জামাদানী নক্সা বোনার প্রকার ধরণের।

১। বুটিদার নক্সা ২। তেরছি নক্সা বা তেসরি নক্সা ৩। জালি নক্সা বা জাল নক্সা।

বুটিদার নক্সা ফুল পাতা লতা বা কোন প্রতীকের পূর্ণ বা আংশিক আকৃতির ছবি বিচ্ছিন্নভাবে সারা শাড়ীর জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বোনা নক্সা।

তেরছি নক্সা বা তেসরি নক্সা হলো শাড়ীর জমিনের অংশে এক পাড় থেকে অপর পাড় পর্যন্ত আড়াআড়ি করে হেলানো ভাবে বোনা নক্সা যা কোনো ক্রমেই পাড়ের নিজস্ব নক্সার ধারাকে বিঘ্নিত করবেনা।

জালি নক্সা বা জাল নক্সা হলো সারা শাড়ীর জমিনে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা রেখা চিত্রের নক্সা।

শাড়ীর আঁচল ও পাড়ের নক্সার সাথে জমিনের নক্সার তেমন কোন সংযোগ থাকে না। তবে জামদানী শাড়ীর নামকরণ হয় জমিনের নাম অনুযায়ী। পরিবেশ, প্রকৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার, সমসাময়িক ঘটনা, কল্পনাশ্রিত বিশ্বাস সাধারণত জামদানী নক্সার উৎস।

আঁচল ও পাড়ের সাথে জমিনের নকশার তেমন কোন সংযোগ থাকে না। আঁচল ও পাড়ে স্বতন্ত্র নকশা খাড়া বা তোলা হয়। তবে শাড়ীর পরিচিতি মেলে জমিনের নকশা দিয়ে। পরিবেশ, প্রকৃতি কল্পনাশ্রিত বিশ্বাস ও সমসাময়িক ঘটনা নকশার উৎস। নকশার নাম করণ থেকে তা বোঝা যায়। শত শত নাম রয়েছে জামদানী নকশার। জমিনের নামে শাড়ীর নামকরণ হলেও আঁচল ও পাড়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। জামদানীর উৎস যেটাই হোক না কেন আজ একথা অনস্বীকার্য মসলিন জামদানী আজো বেচে আছে ঢাকাই জামাদানীর মাঝে। ঢাকাই জামদানী তার নির্মান কৌশল, বয়ন কৌশল অকৃত্রিম অক্ষুন্ন রেখে আপন মহিমা নিয়ে জামদানী বয়ন শিল্প আজও বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল রং বাহারি মনকাড়া নকশার জন্য স্বীকৃত অনন্য বয়ন শিল্প।

জামদানী শাড়ীতে যে সকল নকশা তৈরি করা হয় ঐ নকশাগুলো বংশপরম্পরায় তৈরী হচ্ছে। জামদানী তাঁতী গণ নকশা তৈরি করেন তাদের নিজস্ব কল্পনা থেকে।

এই কল্পনার উৎস হলো তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, প্রকৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবনযাপন ও আচার অনুষ্ঠানের উপকরণের বিষয়বস্তু সমূহ। জামদানী তাঁতী বা কারিগর গণ যখনই শাড়ী তৈরি করতে বসেন মনে মনে একে রাখেন তারা কি নকশা তৈরি করবেন এবং তাদের হাতে যতক্ষণ পর্যন্ত কান্ডাগো নামে ছোট যন্ত্রটি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাথায় নকশার জন্য হিসেব হতেই থাকবে। শুধু তাই নয় একটি নকশাকে কেন্দ্রকরে তাঁতী কারিগরগণ বা সাউদগন কয়েকটি নকশার ছবি মনে মনে তৈরি করে ফেলেন। তাদের জামদানী তাঁতের নকশার জন্য কারো নিকটে যেতে হয়না। যদি কোন ক্রেতা তাদের কাছে কোন নকশা দিয়ে ঐ নকশা তৈরি করতে বলেন তখনই তারা করে দেন। কারণ জামাদানী তাঁতীরা নিজস্ব নকশা ছাড়া অন্য কারও নকশা করেন না। তবে কেউ যদি অর্ডার সবরবরাহ করার জন্য নকশা তৈরি করে তাঁতীদের দেন তাহলে তারা যে কোন নকশা তৈরি করতে সক্ষম। এই জামদানী তাঁতী ও কারিগরগণ এতই দক্ষ এবং নিপুন যে যদি কোন জায়গায় কোন রকমের নকশা একবার দেখেন এতেই তারা ঐ নকশা শাড়ীতে উঠাতে সক্ষম। তাই জামদানী তাঁতীদের কারও কাছে যেতে হয় না। আদি কাল থেকে এযাবৎ জামদানী তাঁতীরা তাদের নিজের মেধা থেকে আঁকা নকশার কাজই করে আসছেন।

পড়ের নকশার নামকরণ ঃ ১) পুইলতা পাড় ২) কড়লা পাড় ৩) কলকা পাড় ৪) বেলপাতা পাড় ৫) বটপাতা পাড় ৬) কেচি পাড় ৭) কাচি পাড় ৮) দুবলা পাড় ৯) কুকিস পাড় ১০) ডাউস পাড় ১১) ইঞ্চি পাড় ১২) গান্দি পাড় ১৩) কুল পাড় ১৪) চাইবানা পাড় ১৫) হোগলা পাড় ১৬) কচুরি পাতা পাড় ১৭) কচুরি ফুল পাড় ১৮) দশগাইন্না পাড় ১৯) গোলাপদুর পাড় ২০) পোরাহাজ পাড় ২১) লত পাড় ২২) লততর পাড় ২৩) মদুলি পাড় ২৪) কালির মালা পাড় ২৫) চাটাই পাড় ২৬) ডালুম পাড় ২৭) করাত পাড় ২৮) করিং পাড় ২৯) চার পাতা পাড় ৩০) ছয় পাতা পাড় ৩১) বইল ফুল পাড় ৩২) কাহাইল্লা পাড় ৩৩) ঢেকি পাড় ৩৪) মাইয়োর পাড় ৩৫) শাল পাড় ৩৬) ঝল্লর পাড় ৩৭) টাংগাইলা পাড় ৩৮) বেতুম পাড় ৩৯) সাজনা পাতা পাড় ৪০) কাহই পাড় ৪১) আমিরতি পাড় ৪২) সাপের কাটা পাড় ৪৩) কাটা চার পাতা পাড় ৪৪) ডরিং পাড় ৪৫) আম কলকা পাড় ৪৬) আম পাড় ৪৭) মোট পাড় ৪৮) নিশান পাড় ৪৯) আয়োব গেট পাড় ৫০) আংটি পাড় ৫১) সাবুদানা পাড় ৫২) পোরান গোলাপ ছর পাড় ৫৩) বার গাইন্না পাড় ৫৪) ষোল গাইন্না পাড় ৫৫) দুবলা জাল পাড় ৫৬) মান্দার কুল পাড় ৫৭) সংঙ্খ পাড় ৫৮) সংঙ্খ কড়লা পাড় ৫৯) নিমপাতা পাড় ৬০) আদার ফানা পাড় ৬১) সামুক পাড় ৬২) বড় ফড়িং পাড় ৬৩) প্রজাপতি পাড় ৬৪) চশমা পাড় ৬৫) সূর্যমুখি পাড় ৬৬) কলমি লতা ৬৭) কলডোগা পাড় ৬৮) উইছতা পাড় ৬৯) সরকা পাড় ৭০) শাপলা ফুল পাড় ৭১) পদ্য ফুল পাড় ৭২) ঝিনুক দানা পাড় ৭৩) ছয় মাদুলি লতা পাড় ৭৪) করলা বিচী পাড় ৭৫) চান্দব কান্দি পাড় ৭৬) মননলি পাইর ৭৭) জাম্বুরা পাইর ৭৮) বৌ পাইর ৭৯) ময়ুর পেকম পাইর ৮০) খালা বাস পাইর ৮১) ডালা পাইর ৮২) পক্ষী পাইর ৮৩) ঝুড়ি পাইর ৮৪) চিনির বাসন ভাঙ্গা পাইর ৮৫) পুটি মাছ পাইর, ৮৬) চানবাকা পাইর, ৮৭) ঘুড্ডি পাইর ৮৮) আংটিবেড পাইর ৮৯) কলার ফানা পাইর ৯০) হাজাপান্না পাইর ৯১। হাজ মোতি পাইর ৯২) খদ্দর পাইর ৯৩) কচি পাতা পাইর ৯৪) শামুক তেছরি পাইর ৯৪) সদেশ পাইর ৯৫) ডালিম মোড়া পাইর ৯৬) গোলফুর পাইর ৯৭) মহরের ঘর পাইর ৯৮) গাছ পাইর ৯৯) চালতা পাইর ১০০) নাও পাইর ১০১) বাদাম পাইর ইত্যাদি।

জামদানী শাড়ীতে তেছরি নকশার নামকরণ

১। সামুক তেছরি ২। সাবুদানা জাল ৩। আদার ফানা তেছরি ৪। কলার ফানা তেছরি ৫। আংটি জাল ৬। চিনি বাসন ভাঙ্গা জাল ৭। দুবলা জাল ৮। করাত তেছরি ৯। কাটা তেছরি ১০। শাপলা তেছরি ১১) পুই লতা তেছরি ১২) লত জাল ১৩) চাটাই জাল ১৪। কড়লা তেছরি ১৫। সংঙ্গা তেছরি ১৬। পাটি তেছরি ১৭। আম তেছরি ১৮। আংটি তেছরি ১৯। মই তেছরি ২০। যাদুর তেছরি ২১। খইয়া জাল ২২। ঢেউ জল ২৩। ডরিং জাল ২৪। গান্দি তেছরি ২৫। মাদুলী তেছরি ২৬। বুটি তেছরি ২৭। বিচ্ছু তেছরি ২৮। কলকা তেছরি ২৯। গোল জাল ৩০। বাইমা তেছরি ৩১। হোগলা তেছরি ৩২। মটর তেছরি ৩৩। পান তেছরি ৩৪। ডালিম তেছরি ৩৫। মটর তেছরি ৩৬। মইউর তেছরি ৩৭। গুমটা জাল ৩৮। পোন তেছরি ৩৯। মাছ জাল ইত্যাদি।

বুটি নকশার নামকরণ

কড়লা, জুই ফুল, পদ্য ফুল, আশ্রবি, বেল ফুল, ছিটা ডালিম ফুল, উইছতা ফুল, দুবলা ফুল, দুবলা বুটি, চিরা বুটি, মাছ বুটি, চান্দামাছ বুটি, মটর বুটি, রেড ক্রস বুটি, যাদুর বুটি, বিচ্ছু বুটি, বিলাই আড়া বুটি, আম বুটি, জামের বিচি, খিরাই বিচি, সামুক ফুল, বেতুম বুটি, সিংগাড়া ফুল, করাত বুটি, আপেল ফুল, সন্দেস বুটি, সন্দেস ফুল, কাকড়া বুটি, তেপাত্বী বুটি চিড়ার ফুল, সঙ্গবুটি, কড়ি বুটি, আংটি বুটি, ডালিম পাতা, আম পাতা, বড়ই পাতা, বড়ই বুটি, ভাগনলি ফুল, ডালিম ফুল, বেল পাতা, পদ্যফুল, যাদুর ফুল, আম ফুল, জাম ফুল, বইল ফুল, ডরিং ফুল, মরিছ ফুল, বেতুম ফুল, সিমের দানা, লইব্বা ফুল, কাকড়ল বুটি, হল্লি ফুল শাপলা ফুল, কাকড়ল চিরা, ঘুড্ডি ফুল, ঘুড্ডি বুটি, নাটাই বুটি ইত্যাদি।

দুবলা বা আংটি জাল এই নকশার বুলি নিম্নরূপঃ

কাঃ জোর জমিনে দুবলা জালের বের অইব দুবলা জালের বের জোর।

সাঃ জমিনে কতটুকু পর পর অয় মাপ দিয়া দেন।

কাঃ জোর প্রথম পাইরে তেনে ২৫ কোন্ডা রাইখ্যা ১২ কোনায় জোর, পারেরডা ৫৫ গুন্ডা বাদ দিয়া জোর এই মাপে কয়ডা অয় হেই কয়ডাই জোর।

কাঃ জোর ১২ কোনায় প্রথমে টানা মোট ঠেলা মোড়ড হইর অইব, আবার টানা মোডে ১ কোনা করে ঠেলা মোডে ও ১ কোনা বারবে ১ কোনা পেছে অইবো বাবে ৪ মোড বুনো।

সাঃ ১২ কোনো জোইরা ১ কোনা কইরা দুনো দিগে বারাইছি ১ কোনা পিছে লইছি।

কাঃ ঠিক আছে টানা মোড, ১টা গান জোর ৫ কোনায় পরের গানডাও ১ কোনো পেছে লইয়া ৫কোনায় বোন, ঠেলা মোডে ১ কোনা পেছে লও ১টা আর একটা ১ কোনা গাডাও ১ কোনা বারাও টানা মোট, পয়লাডা ১ কোনা গাডাও ১কোনো বারাও পরেরডা ১কোনা পেচে লও এইভাবে ৬জোর বুনো।

সাঃ ১ কোনো গাডাইয়া ১ কোনা বারাইয়া ১ কোনো পেচে লইয়া ৬ জোর অইছে, ৬ জোর অইয়া পাতাডা ১৪ কোনায় অইছে।

কাঃ এবার কাংগুরা করা ২০ কোনো।

সাঃ ২০ কোনো বারছি।

কাঃ পরের গানও ২০ কোনা করা

সাঃ পরেরডাও বারাইছি।

কাঃ এবার টানা মোডে আগে যেইডা বারাইছি হেইডা হইর বুনো, আর পরে যেইডা বারাছ হেইডা হইর বুনো ঠেলা মোড। এবার পয়লাডা ৪ কোনো বারাও হইরে আর পরেরডা হইব অইব, টানা মোড পয়লাডা হইব পরেরডা ৪ কোনা বারাও ঠেলা মোড হইল অইব, টানা মোডে পয়লাডা ৪ কোনা ছোডাও পরেরডা হইর অইব ঠেলা মোড পয়লাডা হইর অইব পরেরডা ৪ কোনা ছেডবো। টানা মোড পয়লা ৮কোনা ছেডবো পরেরডা হইর অইব। ঠেলা মোড পয়লা ১কোন গাডায় ৫কোনা কোনা অইব পরেরডা ৫কোনায় অইব পরে পরেরডা ১কোনা গাডে ১ কোনা করে পরে ১ কোনা পেছে গানে গোরে হইব। এইবার ফুল জোর ফুল পয়লা কাংগুরায় গোড়া ৪ কোনায় খাড়া অইব ৪ মোট পরে ৪ কোনা কইরা দুনো দিকে বারাইয়া দিবা দিয়া ৪ জোর বুনাবা পরে ৪কোনা ছোড়াইয়া দিয়া ফুলের মাথার মাঝখানে ৬ কোনায় আলোয়া ৪ মোড বুনার পরে থুইয়া দিবা এই বারে ৩ডা ফুল অইব ৩ডা কাংগুরা অইব পরে উপরের ফুল অইব।

সাঃ উপরের ফুল কইয়া দেন।

কাঃ ফুল জোর খারালত না ছাইরা ৬ কোনায় ফুল জোর ২জের হইলে খারা অইব পরে ৬কোনা করে ১ কোনা ঘাড়াইয়া ৬ কোনা আবার বারে, এবার ১কোনা করে ঘাডে ৩ জোর হইল কাডার লাগে ৪ কোনা বাদ দিয়া ৬ কোনায় ১টা ঝাল্লর জোর কোনাডে করে মধ্যে টিপ অইব এই করে শেষ করতে হয়। বুলি শেষ অইল দুবরা জালের প্রকাশ রইর যে ১জোর বলিতে ২বার বুনতে হয়, একটি নকশা বুনার পর ১জোর মোট বলতে ১বার একটা মোট বুনলেই হয়।

প্রত্যেকটা জাল বেরের বুলিগুলি এইভাবে থাকে

চুম্বক শব্দ বলতে এই কয়েকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ঃ হইর, ঘাটাও, বারাও মসলিম জামদানী বয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রায় ষোল ধরণের কারিগর এই শিল্পের সাথে জড়িত। একদিকে মসলিন জামদানী ধলেশ্বরী, শীতলক্ষা বেষ্টিত এলাকার মানুষের জীবিকা নির্বাহের সহায়ক। অন্যদিকে এই জামদানী বয়ন শিল্পীগণ ইতিহাসে সৃজন শীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে।

একদিন ইংরেজগণ মসলিন বয়ন শিল্পীদের আঙ্গুল কেটে মসলিন বোনা বন্ধ করে রচিত করেছিলেন কলংকিত ইতিহাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন না একদিন ইংরেজদের লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে সভ্যতার কাছে বাংলার মসলিন ধ্বংসের জন্য। খোলা বাজার ও যান্ত্রিক শিল্প উন্নয়নের সুযোগে জামদানী মসলিনের হাজার হাজার নকশাকে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে কেবল নক্সা অনুকরণ করে যেন তেন শাড়ী বা মৌলিক নক্সার অপপ্রচার না করা হয় সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি এখনই রাখতে হবে। এই দিকটা পরম মমতা নিয়ে আমাদের সবাইকে অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহাড়া দিতে হবে। আদিও অকৃত্রিমভাবে বেচে থাকুক বাংলাদেশের ঢাকাই জামদানী নক্সার শাড়ী, শাড়ীর জগতে অন্যতম নক্সার শাড়ী হিসাবে।

মুক্তবাজার কর্মকান্ডে বিশ্বনন্দিত মসলিনের পঞ্চম কন্যা জামদানী তার অনন্য নক্সার জন্য আবার সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হোক বাংলাদেশের দিকে। যারা ভাষার জন্য লড়াই করে, লড়াই করে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য, মসলিন জামদানী সেই দেশে হয় এই পরিচিতি হোক বাংলাদেশের।

লোক কারুশিল্প ঃ বাণিজ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন

আবু তাহের খান

পৃথিবীর অন্যত্র যেমনি, তেমনি বাংলাদেশেও শিল্পের (industry) ইতিহাস বস্তুতঃ লোকজ কারুশিল্পেরই ইতিহাস।বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে, আজকের মতোই অতীতের সেই দিনগুলোতেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল দরিদ্য ও কৃষিজীবী। আর এই দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষ এখন যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম নন, তেমনি তার চেয়েও বেশী অসক্ষম তারা অতীতেও ছিল; তা গোলাভরা ধানের কাল্পনিক ইতিহাসের কথা যতোই প্রচার করা হোকনা কেন, সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে সেগুলো কখনোই ছিল না। অবশ্য এই ঘাটতি উৎপাদনের টানাপোড়েনের মধ্যে থেকেও বরাবরই এদেশের মানুষ তাদের খাদ্য বহির্ভূত অনেক ব্যবহার্য্য পণ্য নিজেরাই উৎপাদন করতো এবং কখনো তাদের সেসব উৎপাদিত পণ্য নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হতো। আর নিজস্ব চাহিদা পূরণ কিংবা নিজেদের ব্যবহার্য্য চাহিদার অতিরিক্তহিসেবে এধরণের যেসব পণ্য বা পণ্য সামগ্রী তারা সে সময়ে উৎপাদন করেছে, সে গুলোর অধিকাংশই ছিল হস্ত কারুশিল্পজাত পণ্য এবং বলতে কি, উৎপাদন ঘাটতির ওই টানাপোড়েনের মধ্যেও এই হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যই তাকে দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহে অনেকখানি সহায়তা করেছে এবং আত্মসহায়তা সৃষ্টির তাগিদ থেকেই এ দেশের কৃষিজীবি মানুষ কৃষিপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উৎপাদনে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছে।

আদিতে অবশ্য এদেশের মানুষের কাছে হস্ত ও কারুশিল্প উৎপাদনের বিষয়টি মুলতঃ নিজস্ব গার্হস্থ্য চাহিদা মেটাবার পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে কিছু কিছু পণ্য আবার উপঢৌকন হিসেবেও তৈরী হতো, যেমন–নকশী কাঁথা, শীতল পাটি ইত্যাদি। পরবর্তীতে সাধারণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এসব পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও সে

সূত্রে এসবের বিক্রয় সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ার ফলে এবং উৎপাদকরে ও রোজগারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব পণ্যের বাড়তি উৎপাদনের বিষয়টি তাদের চিন্তায় প্রবেশ করে এবং সে সূত্র ধরেই বস্তুত ঃ এদেশে হস্ত ও কারুশিল্পর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়।

আগে বাংলাদেশে হস্ত ও কারুশিল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন মূলত ঃ স্থানীয় বাজারের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখেই পরিচালিত হলেও অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখন থেকে দু'শ' বছর আগেও এ দেশ থেকে বিভিন্ন প্রকারের হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হতো, যার মধ্যে বিশ্বখ্যাত মসলিনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশর আদি সমাজে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের বেচা-বিক্রি বা এর বাণিজ্যায়ন শুরুর ক্ষেত্রে বাড়তি অর্থোপার্জনের একটি প্রচ্ছন্ন তাগিদ থাকলেও এর পশ্চাতে মূল বিষয়টি ছিল কারুশিল্পীর মনোজগতের চিন্তা ও সৌন্দর্য্যকে কাজে লাগিয়ে তার উৎপাদিত পণ্যের একটি নান্দনিক সুষমা সৃষ্টি। আর বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারায় এদেশের অগণিত কারুশিল্পীর মেধা ও মননে গড়ে ওঠা এই নান্দনিক সুষমাই হচ্ছে এ ভূখন্ডের লোক ও কারুশিল্পের অন্যতম প্রধান ভিত্তি, একই সাথে যা বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল ধারার অন্যতম উপাদানও। আর সংস্কৃতির মূল ধারায় অন্যতম উপাদান হিসেবে এ দেশের লোকজ কারুশিল্প আমাদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নির্মাণে যেমনি সহায়ক হয়েছে, তেমনি তা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনাচারণকেও অনেকখানি স্বচ্ছলতা ও স্বনির্ভরতা এনে দিয়েছে। আর শিল্পের সাথে সংস্কৃতির এই যে মেলবন্ধন, সেটাই আমাদের পথ চালার প্রধান ভিত্তি, আমাদের টিকে থাকার প্রধান ভরসা ও অবলম্বন। তবে এপ্রসংগে বলা প্রয়োজন যে, শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যকার এই মেলবন্ধনটি কখন কতোটা কি ভাবে রক্ষিত হবে, তা বস্তুতঃ নির্ভর করে সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তনের ধারার সাথে এসব শিল্পের (লোকজ কারুশিল্পের) অর্থনৈতিক গুরুত্বটি কতোটা দক্ষতার সাথে টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তার উপর।

মূল ধারার সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কারুশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্বের উপরোক্ত ধারণাটিকে বিবেচনায় রেখে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টি হচ্ছে, নাগরিক ধাচের বিপণন পক্রিয়ায় এর প্রকৃত উৎপাদকের সাথে তার ক্রেতার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দু'য়ের মাঝখানে বিরাজ করছে এমন একটি মধ্যস্বত্তভোগী শ্রেণী, যারা উৎপাদক ও বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই অযৌক্তিক হারে মুনাফা লুটছে এবং কোন অবস্থাতেই উৎপাদক ও ক্রোতাকে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বাজারে হস্ত ও কারুশিল্পের ব্যবসাটিকে যে পরিমাণ রমরমা মনে হচ্ছে, সে পরিমাণে কিন্তু এ কারুশিল্পীদের অবস্থার পরিবর্তন হচেছ না এবং সুরম্য বিপণী কেন্দ্রে এ ধরণের জৌলুসপূর্ণ ব্যবসায়ের আড়ালে নিভৃতচারী খেটে খাওয়া দরিদ্র কারুশিল্পীর ফ্যাকাশে চেহারা দিনে দিনে আরো করুণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ঢাকা শহরের অভিজাত বিপণী বিতানে মাঝারি মানের যে জামদানী শাড়ীটি দু' থেকে তিন হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে সে শাড়ীর মূল্য বাবদ এর উৎপাদক তাঁতী পাচ্ছেন মাত্র ছ' থেকে সাতশ' টাকা। বাদবাকী ১৩শ' থেকে ২৩শ' টাকাই চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্তভোগী ফড়িয়া ও দোকানদারদের পকেটে বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তির আওতায় ভারত সরকার বেশ

কিছুকাল বাংলাদেশ থেকে ভারতে জামদানী শাড়ী আমদানীর ক্ষেত্রে শূন্য শূল্ক সুবিধা প্রদান করে আসছে এবং এ সুবিধা ভোগ করে বাংলাদেশের বহু জামদানী রপ্তানীকারক ইতোমধ্যে ব্যাপক ভাবে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু এ সুবিধার সামান্যতম কোন সুফলও কি বাংলাদেশের হতভাগ্য জামদানী তাঁতীদের ভাগ্যে জুটেছে?

দেশে বিদ্যমান শুল্ক ও কর কাঠামোর আওতায় বর্তমানে যে কোন হস্ত ও কুটির শিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হলে তা থেকে যে আয় হবে, তার সবটাই আয়কর মুক্ত। সরকারের এ আর্থিক প্রণোদনা কর্মসুচীর আওতায় ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের মত হস্ত ও কারুশিল্প রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে সরকারকে কোটি কোটি টাকা করদান থেকে বিরত থাকলেও এর আর্থিক সুবিধার সামান্য ভগ্নাংশও উৎপাদক কারুশিল্পীদের ভাগ্যে জুটছে নাসবটাই ভাগ করে নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে করে আপাতত ভাবে দেশের হস্ত ও কারুশিল্পের উৎপাদনের কাজটিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের স্বার্থে কিছুটা টিকিয়ে রাখছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে এ আশঙ্কা জাগা খুবই স্বাভাবিক যে, ক্রমবর্ধমান হারে বঞ্চনার শিকার হতে হতে এক সময় এই কারুশিল্পীরা তাদের নিজেদের পেশায় টিকে থাকতে আগ্রহী হবেনতো? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ইতোমধ্যেই কিন্তু এদেশের অনেক কারুশিল্পী তাদের পূর্বপূরুষের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র পেশান্তরিত হচ্ছেন, যা একটি চরম উদ্বেগের বিষয় বৈকি! বাংলাদেশের লোক কারুশিল্প ও এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত কিংবা এ ব্যাপারে যে সব সচেতন নাগরিকবৃন্দ নৈতিক ভাবে কিছু করার ব্যাপারে দায় বোধ করেন, তাদের সকলেরই উচিত হবে বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা ও এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টির মধ্যেমে এ বিষয়ে নীতি -নির্ধারক মহলকে তরিৎভিত্তিতে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করা।

গত দু'শতকের ব্যবধানে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ও এতদ্‌সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়টি দারুণ ভাবে পাল্‌টে গেছে। এর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা হ্রাস পাবার মত কিছু কিছু ইতিবাচক ঘটনা ও স্থুল ভোগবাদী প্রবণতার ক্রমঃসম্প্রসারণের ফলে মানুষের চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে শৈল্পিক ও নান্দনিক সুষমাগুলো সম্ভবতঃ খুবই দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে লোকজ কারুশিল্পগুলোর টিকে থাকা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে আমাদের লোকজ কারুশিল্পগুলোর সাথে প্রায়োগিক অর্থনীতির সুত্র-সমূহকে গ্রথিত করে যদি এগুলোকে আধুনিক ক্রেতার রুচি ও চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা যায়। অর্থাৎ এসব কারুশিল্পের নান্দনিক বোধগুলির সাথে এসবের অর্থনৈতিক মূল্যকে যদি উপযুক্ত কৌশলে সন্নিবেশিত করাসম্ভব হয়, তাহলে ধারণা করা চলে যে এসব নান্দনিক সৌন্দর্য্যই এক সময় আবার বস্তুগত সম্পদের চেয়ে অধিক মূল্যবান হয়ে পড়তে পারে, যার কিছু কিছু লক্ষণ ইতোমধ্যেই উকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে।

তবে এবিষয়টিকে অর্থাৎ কারুশিল্পের নান্দনিক সুষমা সাংস্কৃতিক চেতনার সাথে এর অর্থনৈতিক দিকটিকে সমন্বিত করার ধারণাটিকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে এজাতীয় কারুশিল্পের মুল মোটিফকে অক্ষুন্ন রেখে ব্যাপক মাত্রায় এসবের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং এসব পণ্যের বহুমুখীকরণের (diversification) উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

আর তা করতে হলে এসব ক্ষেত্রে নতুন নতুন মডেল ও নকশার প্রয়োগ ঘটানো যেমন জরুরী, তেমনি সেসব মডেল ও নকশা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যে সুযোগ দেশে বর্তমানে খুবই সীমিত। তদুপরি লোকজ কারুশিল্প পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ এবং এটিও মুলতঃ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

বাংলাদেশের লোকজ কারুশিল্পের তালিকায় নকশী কাঁথা, শীতল পাটি, জামদানী, সতরঞ্জি, মৃৎপাত্র, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, তামাকাসা ও পিতলের তৈরী দ্রব্য কাঠের কাজ ইত্যাদির নান্দনিক সৌন্দর্য্য পৃথিবীর যে কোন জনগোষ্ঠীর মানুষকেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করতে সক্ষম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, এসবের অধিকাংশই উন্নত কাঁচামাল থেকে তৈরী হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এসবের নকশা ও ফিনিশিং মানসম্মত নয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদাকে এসব পণ্য মানের দিক থেকে মোটেও পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে, পৃথিবীর অন্যান্য যে সব দেশ বর্তমানে এজাতীয় পণ্য উৎপাদন করছে, তাদের সেসব পণ্যের সাথে বাংলাদেশের পণ্যের মান একে বারেই তুলনীয় নয়, যদিও এসব বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিটির সাথেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকর্ষণীয় মোটিফ রয়েছে। আমরা যদি আমাদের এসব পণ্যের নিজস্ব মোটিফকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে তার সাথে নকশা ও ফিনিশিংয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা মানোন্নয়ন ঘটাতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমাদের কারুশিল্প পণ্যও বিদেশে যথেষ্ট মর্যাদা ও আকর্ষণ কুঁড়াতে পারবে বলে আশা করা যায়।

মনে রাখা দরকার যে, অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীতে এখন স্থানীয় বাজার বলতে কিছু নেই। সারা পৃথিবী মিলে এখন একটাই বাজার বিশ্ববাজার। ফলে অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে যেমনি, তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও যা কিছু উৎপাদন করা হবে, তার সবটাই হতে হবে আন্তর্জাতিক বাজারের কথা চিন্তা করে। ফলে এসবপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নকশা ও মানের বিষয়টি এখন অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থনীতির বিশ্বায়ন এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও তদ্‌নির্ভর স্যাটেলাইট প্রযুক্তির (যা এখন আকাশ সংস্কৃতি নামেও পরিচিত) দ্রুত বিকাশের ফলে এ দেশে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ যেমন ঘটছে, তেমনি আবার এসুযোগও তৈরী হয়েছে যে, ইচ্ছে করলে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির শক্তিকে ব্যবহার করে এটিকে বিশ্বসংস্কৃতির শক্তিমান উপাদানেও রূপান্তরিত করতে পারি। তবে সে পারা না পারাটা অনেক খানিই নির্ভর করছে এ ক্ষেত্রে কী মাত্রায় আমরা আমাদের নৈপূণ্য ও দক্ষতাকে ব্যবহার করতে পারবো, তার উপর। এ সূত্রে সংস্কৃতির যে যে শক্তিকে আমরা নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারি, তন্মধ্যে বাঙালির লোক কারুশিল্পের শক্তি অন্যতম। আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকায় বাঙালি খাবার খুবই জনপ্রিয়। এটি নিঃসন্দেহে পশ্চিমা সংস্কৃতির উপর বাঙালি সংস্কৃতির একটিআধিপত্য। তো, হাভাতে বাঙালি যদি তার খাদ্য সংস্কৃতি দিয়ে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাহলে সে তার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত সুষমামন্ডিত কারুশিল্পের নান্দনিক শক্তি দিয়ে বিশ্বসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারবে না কেন? বরং যথাযথ প্রচেষ্টা নিলে বাঙালির কারুশিল্পের সংস্কৃতি বিশ্বসংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিমান ধারাগুলোর একটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেপারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর সে ক্ষেত্রে এ দেশের লোক-কারুশিল্প শুধু বাঙালি সংস্কৃতির সাথেই মেলবন্ধনে আবদ্ধ থাকবেনা, সেটি বিশ্বসংস্কৃতির সাথেও অভিন্ন মেলবন্ধনে জড়িত হয়ে পড়বে।

সরকার লোক-কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও পরিচর্য্যার জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠান এবং এ শিল্পের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের মত সংস্থা গড়ে তুললেও মানতেই হবে যে, এসব প্রতিষ্ঠানের আওতায় এ শিল্পের সাথে জড়িত প্রকৃত কারুশিল্পীদেরকে তাদের পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সকল সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা, যে কারণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গত এক দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশের রপ্তানী আয় ১৯৯০-৯১ অর্থবছরের ১,৪১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৫,৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে (১৯৯০-৯১ অর্থ বছরের তুলনার ৪ গুণ) উন্নীত হলেও হস্তশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী ১ ডলারও বাড়েনি। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে যেখানে বাংলাদেশ থেকে হস্থশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে এক দশক পর ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এসেও রপ্তানীর উক্ত পরিমাণ সেই ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, মাঝখানে দু' এক বছর তা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও হস্তশিল্প পণ্যের স্থানীয় বাণিজ্যিক পরিস্থিতিও মোটামুটি রপ্তানী বাণিজ্যেরই অনুরূপ।

স্থানীয় বাজারেও হস্তও লোক-কারুশিল্পের ব্যবসায়ের পরিসর খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। এমনটি কেন হচ্ছে, সে বিষয়ে চট্‌করে মন্তব্য করা খুবই কঠিন। তবে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের উচিত হবে এ বিষয়ে একটি পূর্ণাংগ সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে প্রকৃত কারণ সমূহ খুঁজে বের করে দেখা। তবে সে সমীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করেও বলা যায় যে, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তা একদিকে যেমন আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ক্ষতির কারণ, অন্যদিকে তেমনি তা হস্ত ও লোক-কারুশিল্পের অস্তিত্বের জন্যও বিরাট হুমকি স্বরূপ। ফলে বিষয়টির প্রতি খুবই জরুরী ভিত্তিতে মনোযোগী হওয়া উচিত বলে মনে করি।

বাংলাদেশে হস্ত ও কারুশিল্পের বর্তমান উৎপাদন পরিস্থিতি, গুণগত মানের স্তর, রপ্তানী সম্ভাবনা, আর্থিক ও দক্ষতাজনিত সমস্যা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের লালন ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হলো, যার মধ্যে কতগুলো এখনই বাস্তবায়নযোগ্য এবং বাকীগুলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সুপারিশমালাগুলো হচ্ছেঃ

১। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খ্যাত-অখ্যাত সকল হস্ত, লোক ও কারুশিল্পের একটি পুর্ণাংগ তালিকা বা ডাইরেক্টরি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এটি এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে এটিকে বাংলাদেশী কারুশিল্পের একটি পুর্ণাঙ্গ এনসাইক্লোপেডিয়া হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক একক ভাবে অথবা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) এর সাথে যৌথ ভাবে এ কাজটি একটি দু' বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন হতে পারে।

২। হস্ত ও কারুশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগর ও কারুশিল্পীদের দক্ষতার মান উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্ধিত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনও এ ব্যাপারে নির্বাচিত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করতে পারে।

৩। বাংলাদেশের কতিপয় সম্ভাবনাময় নির্বাচিত কারুশিল্পের উপর বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফউন্ডেশন 'কারুশিল্পের নকশা' বিষয়ক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারে, যা নির্ধারিত মূল্যে উদ্যোক্তাদের কাছে বিক্রয় করা হবে। দু'এক বছর পর পরই নতুন নতুন নকশা সংযোজনের মাধ্যমে পুস্তকটির সংস্করণ করা যেতে পারে।

৪। পণ্যের মানোন্নয়ন এবং পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক ও বিশ্ববাজারের ক্রেতার রুচি ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ নকশার উৎপাদন ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে তা বিতরণের লক্ষ্যে বিসিকের এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

৫। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল কারুশিল্পের সংগ্রহ নিয়ে ঢাকায় একটি জাতীয় ভিত্তিক 'কারুশিল্প এম্পোরিয়াম' প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

৬। বাংলাদেশ লোক ও কারুল্পির ফাউন্ডেশন দু' বছর অন্তর অন্তর ফাউন্ডেশন চত্বরে একটি কারুশিল্পী সমাবেশের আয়োজন করতে পারে। সেখানে তাদের কাছ থেকে সরাসরি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শোনা হবে এবং বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেসব সমস্যার সমাধান কল্পে সমাবেশ সুনির্দিষ্ট সুপারিশ গ্রহণ এবং পূর্বে গৃহীত সুপারিশ সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। প্রস্তাবিত সমাবেশটি বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং বিসিক এর যৌথ উদ্যোগেও হতে পারে।

৭। হস্ত কারুশিল্পের উৎপাদকদেরকে বিপণন সহায়তা দানের লক্ষ্যে ঢাকায় প্রতি বছর একটি জাতীয় ভিত্তিক হস্ত ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। বিসিক এ মেলা আয়োজনের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৮। হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক আরো বর্ধিত পরিসর ভূমিকা পালন করা উচিত।

৯। বিদেশে বাংলাদেশী হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যেরবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস ও মিশনসমূহকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে ইপিবি, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প আজ বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান হওয়া সত্ত্বেও এবং বাঙালি সংস্কৃতির সাথে এর মেলবন্ধন তার অস্তিত্বের গহীনে গ্রোথিত হয়ে থাকলেও মানতেই হবে যে, industry এবং art দু'ভাবেই এ শিল্প আজ সমস্যায় জর্জড়িত এবং এ সমস্যার জালে সবচেয়ে বেশী আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে এর কারুশিল্পীরা। যুগ যুগ ধরে এর (এই কারুশিল্পীরা) আমাদের সংস্কৃতির প্রবহমানতাকে সমৃদ্ধ করলেও এদের নিজেদের জীবনে সমৃদ্ধি কোন দিনই আসেনি। অথচ এঁদেরকে ব্যবহার করে কারুশিল্প বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী ও মধ্য স্বওভোগীরা বরাবরই অত্যন্ত আকর্ষণীয় হারে মুনাফা অর্জন করে এসেছে এবং বলতে কি, এই কারুশিল্প বাণিজ্যের বিষয়টি এখন এদেরই হাতে জিম্মি হয়ে আছে। ফলে হস্ত ও কারুশিল্প বাণিজ্যকে এই মধ্যস্বত্তভোগীদের হাত থেকে মুক্ত করতে না পারলে এ দেশের কারুশিল্পীরা কখনো বঞ্চনার নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না এবং তা না পারলে কারুশিল্পের কাঙ্খিত বিকাশও কোন দিন সম্ভবপর হবে না। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির মূলধারার সংস্কৃতির সাথে কারুশিল্পের মেলবন্ধনকে তাই শিল্প ও বুদ্ধিবৃত্তিক নান্দনিকতা দিয়ে রক্ষা করার স্বার্থেই হস্ত ও কারুশিল্প বাণিজ্যকে ওইসব মধ্যস্বত্তভোগীদের হাত থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন এবং তা করা দরকার এখনই।

টাংগাইল শাড়ীর ঐতিহ্য ও রূপ বৈচিত্র্য

সুকুমার বসাক

মানব সভ্যতার কোন উষাকাল থেকে বয়ন শিল্পের উৎপত্তি তা আজ আর কেউ বলতে পারে না। আদি কালে যখন মানব সভ্যতার পত্তন হয় নাই তখন মানুষ গাছের বাকল, লতা পাতা এবং পশু চর্মের দ্বারা লজ্জা নিবারণ করতো। এরপর কালের প্রবাহে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে নিজের পরিধানের জন্য বিকল্প চিন্তা ভাবনা করতে থাকে এবং এই বিকল্প চিন্তা ভাবনার ফসলই হচ্ছে বস্ত্র শিল্পের উৎপত্তি। সে সময়ে হাতে সুতা কেটে নিজেরাই সেই সুতা দিয়ে সাধারণ ফ্রেমের তাঁতে বস্ত্র বুনন করতো। আর সেই পদ্ধতির ধারা বজায় রেখে বাংলাদেশের টাংগাইলের তাঁতীরা আজো বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়াই সাধারণ হস্ত চালিত তাঁতে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ব বিখ্যাত টাংগাইল শাড়ী তৈরী করে চলেছে।

বস্ত্র মানুষের দেহকে যেমন আবৃত রাখে তেমনি মানুষকে অপরূপ সৌন্দর্যময় মোহনীয় করে তোলে। প্রত্যেকটি মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার সাথে বস্ত্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন রুচিশীল নারীর চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে টাংগাইল শাড়ী নিজস্ব ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে ডিজাইন এবং কালার কম্বিনেশনে বৈচিত্র্য এনেছে।

টাংগাইল শাড়ী ঠিক কতদিন আগে থেকে তৈরী হচ্ছে তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও অনুমান করা হয় যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব থেকে টাংগাইল শাড়ী নামহীনভাবে বা অন্য কোন নামে তৈরী হতো। বিশ্ব বিখ্যাত ঢাকাই মসলিনের সাথে টাংগাইল শাড়ীর একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আজো পাথরাইলে কয়েকটি তাঁতী বাড়ীতে ঢাকাই মসলিন শাড়ী তৈরী হচ্ছে যা সুদূর অতীতকে মনে করিয়ে দেয়।

কোটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে পূর্ব বঙ্গের ঢাকা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষা নদীর ধার ঘেঁষে গ্রামের তাঁতীরা

সূক্ষ্ম সূতি বস্ত্র তৈরী করতো যা ঢাকাই তাঁত বা ঢাকাই মসলিন নামে বিশ্ব নন্দিত ছিল। সাধারণত বাঁশের তৈরী তাঁতে কার্পাস তুলা থেকে তৈরী সূক্ষ্ম সূতা দিয়ে এই মসলিন তৈরী করা হতো। কথিত আছে যে, ১০ গজ লম্বা ১গজ প্রস্থ এক টুকরা কাপড়ের ওজন হতো মাত্র ১০ তোলা। বিশ্বে তখন প্রধান কাপড় ছিল মসলিন সেই সময় প্রাচীন রোমের মেয়েরা ঢাকাই মসলিন ব্যবহার করতো। রোম থেকে মিশর, মিশর থেকে পারশ্যে মসলিন পৌছে যায়। ব্যবিলনেও মসলিনের প্রচলন ছিল। মসলিন তৈরী করতে ১৫০ থেকে ৪০০ কাউন্ট সুতা ব্যবহার করা হতো। ৪০০ কাউন্ট সূতা দিয়ে তৈরী ৮০গজ মসলিন কাপড়ের রোল মোগল সম্রাটের আংটির ভিতর দিয়ে নেয়া যেতো। এই রকম মসলিন নিয়ে অনেক কাহিনী শোনা যায়, শাড়ীর জগতে টাংগাইল শাড়ী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শত শত বৎসর যাবৎ টাংগাইল শাড়ী নিজের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখে আরো সমৃদ্ধ হয়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আপন গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। এবং শাড়ীর জগতে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলেছে। টাংগাইল শাড়ী টাংগাইল জেলাতে তৈরী হতো বলে এই শাড়ীর নাম টাংগাইল শাড়ী। এই শাড়ীর বুনন, কৌশল, রং, ডিজাইন, দৈর্ঘ্য ও বহরে অন্য সব শাড়ী থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ বলেই এই শাড়ী মহিলাদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মন লোভনীয়।

টাংগাইল শাড়ী মিহি সুতা দিয়ে তৈরী করা হয় বলে এই শাড়ী মোলায়েম হয় তাই ব্যবহারে আরামদায়ক। প্রতিটি শাড়ী তৈরী করার সময় এর গুণগত মানের দিকটি যত্নের সাথে লক্ষ্য রাখা হয়। দিনের পর দিন টাংগাইল শাড়ীর জনপ্রিয়তা বেড়ে চলছে। তাই ডিজাইনে আসছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। শাড়ীর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে।

টাংগাইল শাড়ীর সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্টভাবে জড়িত যে তাঁতী সম্প্রদায় তারা হচ্ছে "বসাক" সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী ও ধৈর্য্যশীল। কথায় আছে সূতার চেয়ে যার জাত নরম সেই কাপড় বয়ন করতে পারে। জনশ্রুতি আছে যে, বসাক সম্প্রদায় অবিভক্ত বাংলার মুর্সিদাবাদে বসবাস করতেন এবং সেখানে বস্ত্র বয়ন করতো। আরো জানা যায় যে, কলিকাতায় সুতানুটি গ্রামেও বসাক সম্প্রদায় বসবাস করতেন এবং তারা সূতা ও বস্ত্র বয়ন কাজে সিদ্ধ হস্ত ছিল। মুর্সিদাবাদ ও কলিকাতায় সুতানুটি গ্রাম থেকে বসাক সম্প্রদায় এই অঞ্চলে আসার ফলে এখানে তাঁত শিল্পের বিকাশলাভের গতি বেড়ে যায়। এদের নিপুণ শিল্প কর্মের কথা বাংলা তথা সারা ভারত বর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই তাঁতীদেরই কিছু অংশ টাংগাইল গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং নিজের পেশা তথা বস্ত্র বয়ন কাজ করতে থাকে।

বিভিন্ন জায়গা পরিবর্তনের পর টাংগাইলের মাটি আবহাওয়া, জলবায়ু এই তাঁতীদের জীবনের সাথে এতই ঘনিষ্টভাবে মিলে গেছে যে, টাংগাইলে আজোও তাদের উত্তরসুরীদের আধুনিক টাংগাইল শাড়ীর জনক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। মনে হয় টাংগাইলের পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে টাংগাইল শাড়ীর একটা আলৌকিক সম্পর্ক রয়েছে।

আগের দিনের তাঁতীরা যে ভাবে শাড়ী তৈরী করতো তা আজ ভাবতেও অবাক লাগে। তখন তাঁত বলতে কিছুই ছিল না। তারা সূতায় হাতে মাড় দিয়ে চরকায় নলি করে মাত্র দুইটা নলি দিয়ে সর্বোচ্চ ১২ গজের একটা টানা তৈরী করতো। তখন তাঁতীরা লেখা পড়া জানতো না এমনকি গননা পর্যন্ত জানতো না। তারা টানার সূতা হাতে মূট করেই অনুমান করতে পারতো যে টানাটা ৩ হাজার না ৪ হাজারে সূতোর মধ্যে হয়েছে। তখন দক্ষ বিহীন তাঁতে হাতে মাকু একদিক থেকে অন্য দিকে ছুড়ে শানা টেনে শাড়ী বুনন করতো। এরপর

১৭৩৩ সালে জন কি নামে জনৈক ইউরোপীয় সর্ব প্রথম উন্নত তাঁত আবিষ্কার করেন এবং ক্রমে ক্রমেই এর উন্নতি সাধন করেন। শ্রীরামপুরে ডেনিসেরা বাস করতেন। তখন জনৈক ডেনিস উক্ত নবোন্নত তাঁত তথায় আবিষ্কার করেন এবং সেখান হতেই এই তাঁত বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং শাড়ী তৈরীর গতি অনেক বেড়ে যায়। শাড়ীর বুনন শিল্পী ও হাতের নক্সা পাড়ের কাজ তখনকার দিনের অভিজাত পরিবারের নারীদের পছন্দসই শাড়ী ছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশের ঢাকাসহ ভারতের রাজধানী কলিকাতার বাজার টাংগাইল শাড়ীর দখলে ছিল। বৃটিশ আমলে কলিকাতার বড় বাজারের সকল শাড়ীর দোকানই টাংগাইলের পাথরাইলের বসাক তাঁতীদের দখলে ছিল। টাংগাইল থেকে তখন টাংগাইল শাড়ী কলকাতায় যেতো এবং কলিকাতা থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তো। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্ত হয়ে গেলে অনেক বসাক সম্প্রদায় কলিকাতা থেকে নিজ জন্মভূমি টাংগাইলে ফিরে আসে এবং অনেকে কলিকাতায় থেকে যায় এবং আজো তারা কলিকাতায় টাংগাইল শাড়ীর ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে। আজো সারা ভারতে টাংগাইল শাড়ীর জনপ্রিয়তা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে টাংগাইলের মত অনেক তাঁতী পাড়া গড়ে উঠেছে এবং তারা টাংগাইল শাড়ী তৈরী করছে এবং টাংগাইল শাড়ী নাম দিয়েই ভারতের বাজারে বিক্রিত হচ্ছে। অথচ এই তাঁতীরা টাংগাইলেরই সন্তান তারা ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর আর পূর্ব বঙ্গে ফিরে আসে নাই।

টাঙ্গাইল শাড়ীর বৈচিত্র্যময় ডিজাইন, রং, বুনন শৈলী অন্য সকল শাড়ী থেকে আলাদা মান সম্পন্ন। যখন জ্যাকাড মেসিন ছিল না তখন থেকে আলাদা মান সম্পন্ন। যখন জ্যাকাড মেসিন ছিলনা তখন টাংগাইলের তাঁতীরা ঝাপের মাধ্যমে নক্সা পাড়ের শাড়ী তৈরী করতো। তখনকার দিনে-মাধবী লতা, পদ্ম পাড়, কুঞ্জলতা, ভেলভেট, তেরচি, মরবী, লতাপাতা পাড়ের শাড়ীগুলো বিখ্যাত শাড়ী হিসাবে সমাদৃত ছিল। হাতে বুটিক শাড়ীর কাজ এতোই ও মনোমুগ্ধকর ছিল যা বঙ্গ ললনাদের লোভের বস্তু হয়ে উঠে।

১৮০০ সালে জনৈক্য ফরাসী জ্যাকার্ড নিজ নামে এই মেশিন আবিস্কার করেন। আগের দিনে ঝাপের মাধ্যমে শাড়ীর পাড়ে যে নক্সা হতো, জ্যাকার্ড মেশিনে সেই নক্সা আরো উন্নত ও সহজে করা সম্ভব হতো।

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে টাংগাইলের তাঁতীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষের রুচিসম্পন্ন শাড়ী তৈরী করে থাকে। বহু চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে জীবন সংসারে যুদ্ধ করে শত শত বৎসরের ঐতিহ্যবাহী টাংগাইল শাড়ী এখন আরো উন্নত রূপে তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে এই শাড়ীর ডিজাইন, কালার ম্যাচিং এতই সুন্দর যে, যে কোন রুচিসম্পন্ন মানুষের মনকে আকর্ষণ করবে। এই শাড়ীর পাড়। আঁচলের কারুকাজ এতোই নিপুণভাবে করা হয়ে থাকে যা দেখে মনে হবে আধুনিক কমপিউটারাইজ মেশিনে প্রিন্ট করা হয়েছে। অথচ এই শাড়ীর কাজগুলো করে থাকে গ্রামের অশিক্ষিত তাঁতীরা।

বিংশ শতাব্দির নব্বই দশকের প্রথম ভাগে টাংগাইল শাড়ীর একটা বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে টাংগাইল সফট শিল্ক শাড়ী তৈরী শুরু হয়। এই শাড়ীর একটা বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এই শাড়ীর ডিজাইন ও বুনন সবার দৃষ্টি কাড়ে এবং দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এরপর পর্যায়ক্রমে সফট্ সিল্ক বালুচুরি, তসর সিল্ক,

বংকাই, হাফসিল্ক, সম্বল পুরি তনচু কাতান, সিল্ক কাতান, সানন্দা কাতান, ভেলভেট কাতান প্রভৃতি নামে অত্যন্তভালো ডিজাইন সমৃদ্ধ ও গুণগত মান সম্পন্ন শাড়ী তৈরী হচ্ছে। এখন টাংগাইলের তাঁতী পাড়ার অনেক তাঁতীই বৎসরে দুই ঈদে ও ১লা বৈশাখে নূতন নুতন ডিজাইনের বৈচিত্র্যময় শাড়ী তৈরী করে থাকে। অথচ আজ থেকে ১৫ বৎসর আগে টাংগাইল শাড়ীর মান ও ডিজাইন যা ছিল এখন তার থেকে অনেক বেশী বৈচিত্র্য এসেছে। ১৫ বৎসর আগে বালুচুরি শাড়ী করা যেতো না কিন্তু এখন এই বালুচুরি ডিজাইন কোন কঠিন কাজ নয়। একটি শাড়ীর মূলহলো ডিজাইন ও কালার ম্যাচিং। তাই টাংগাইলের তাঁতীরা প্রতিটি শাড়ী তৈরী করতে কালার ও ডিজাইনের দিকে বিশেষ যত্নশীল থাকেন।

টাংগাইল শাড়ী টাংগাইল জেলার সবকয়টি থানাতেই কম বেশী তৈরী হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ও বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের শাড়ী তৈরী হয় পাথরাইল, চন্ডী ও নলশোঠা গ্রামেই সব গ্রামের তাঁতীরা নিজেরাই নিপুণভাবে ডিজাইন করে নিখুত শাড়ী তৈরী করে থাকে। একটি উন্নত শাড়ী তৈরী করতে ২ থেকে ৪ দিন সময় লাগে। সাধারণ শাড়ী তৈরী করতে ১ দিন লাগে। আবার অনেক দামী শাড়ী ১০ থেকে ২০ দিন সময় লাগে। একটি তাঁতী বাড়ীর বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নারী পুরুষ এমনকি শিশুরাও তাঁতের কাজের সাথে জড়িত।অথচ তাতীরা এতো দুঃখ কষ্ট করে শাড়ী তৈরী করেও উপযুক্ত বাজার পায় না। ফলে প্রান্তিক তাঁতীরা এখনো সেই মধ্যযুগের তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যেই বসবাস করছে।

৮০ দশকে ঢাকায় কিছু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী টাংগাইল শাড়ীর ব্যবসায় সাথে জড়িয়ে পড়েন। এদের সাহায্য সহযোগীতা আধুনিক ডিজাইন সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ধারণায় যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। তবে বৃহৎ কোন পরিকল্পনা নিলে সমগ্রতাঁতিরা উপকৃত হবে। এখানে কোন উন্নত আধুনিক পেশাদার শিক্ষিত ডিজাইনার নেই। নেই কোন উন্নত ডাইং এবং সুতা প্রসেসিং এর ব্যবস্থা। ফলে টাংগালের তাঁতীরা প্রায় সব কাজ হাতে করে থাকে।

এতো কিছু না থাকার পরও টাংগাইল শাড়ী অপরূপ সৌন্দর্যময় নিখুত ডিজাইনে হয় এবং বুনন শৈলী এতো দক্ষতার সাথে হয়ে থাকে যে এই শাড়ীর সাথে ভারত থেকে আসা সিনথেটিক সস্তাদামের শাড়ী আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। আসলে টাংগাইল শাড়ী নারী অঙ্গের আরামদায়ক উপযুক্ত ভুষণ।

লোকজ গীতিনৃত্য প্রসংগ আলকাপ

বিশ্বনাথ সরকার

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির অনেক প্রশংসা করে গেছেন। তিনি বাংলাদেশকে নাচ ও গানের দেশ বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুতঃ বঙ্গ-ভারতীয় উপ-মহাদেশে নাচ ও গান অতি প্রাচীন লোকজ সংস্কৃতির শিল্পভান্ডার। লোকজ গীতিনৃত্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই একটি জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়। নৃত্য, গীত, সাহিত্য, শিল্পকলাই জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ।

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদিতেও নাচ ও গানের বিশেষ প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মহাস্থান গড় (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক), পাহাড়পুর (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক) ময়নামতি (অষ্টম শতক) প্রভৃতি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে যে সব প্রত্ন সম্পদ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে নর্ত্তক, নর্ত্তকী, ঢোলক, বাঁশী, বংশীবাদক, বীণা ইত্যাদি নৃত্য- গীতের নানা সরঞ্জাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্য ও লোক সংগীতে লোক নৃত্যের প্রচুর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই সব সাহিত্যে বাংলাদেশীয় নানা রাগ রাগিনীরও উল্লেখ আছে। যেমন, গৌড়, দেশাগ, বড়ারি ইত্যাদি। এছাড়া চর্যাপদে পটহ, মাদল, করঙ্গ-কমালা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রাদির নামও মেলে। এ থেকে দেশেরলোকজ গীতিনৃত্যের প্রাধান্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। আর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তো আসলে পুতুল নাচকে উপলক্ষ্য করে রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক নাট-গীতের আসর। এই নাট-গীত দেখে শ্রীচৈতন্য মহা প্রভূ বিশেষ আনন্দিত হতেন বলেও বৈষ্ণব মহাজন গ্রন্থাদিতেও উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত গীতিনৃত্যে যে সাজ-সজ্জার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মধ্য যুগে তাকে কাচ বলা হতো, তখন মহা প্রভূ শুধু কাচই করলেন না, অভিনয়ও করলেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়;

"একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে
আজি নৃত্য করিবাঙ অংকের বিধানে,
সদাসিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া
বলিলেন প্রভূ কাচ সজ্জা কর গিয়া।"

"আলকাপ" গানের উৎপত্তি

অতি প্রাচীন কাল থেকে লোকজ সংস্কৃতিতে আলকাপ গানের প্রচলন। 'গম্ভীরা' গানের মত 'আলকাপ' ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় লোকগীতি বা লোকজ গীতিনৃত্য। আলকাপের আদি স্থান বললে বাংলাদেশের রাজশাহী জিলার নওয়াবগঞ্জকে বোঝায়। গম্ভীরাও প্রধানতঃ নওয়াবগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। আলকাপ গান উত্তরাঞ্চলে এক সময়ের অতি জনপ্রিয় গান।

গম্ভীরা গান যেমন 'গম্ভীর নয়, আলকাপ গানও তাই। অতীতে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীর সংগে সম্পর্কও ছিল। বর্তমানে নিতান্তই রঙ্গ-পাচালিতে পরিণত হয়েছে। 'আলকাপ' নামটির অর্থ নিয়ে অনেক গবেষকের অনেক মতামত রয়েছে। অবশ্য নওয়াবগঞ্জ এলাকায় 'আলকাপ গান করা' মানে রঙ-তামাশার মাধ্যমে গান করাকে বুঝায়।

অনেকের মতে সম্রাট আকবরের সংগীত সম্রাট' মিয়া তানসেন' এই গানের প্রবর্তক বলে ধারণা করে থাকেন। আলকাপ নামটি থেকেও অনুমতি হয, কোনো আরবী বা ফারসী শব্দ থেকে আলকাপ শব্দটি প্রচলিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আরবী (লাকাব) অর্থ উপাধি বিশেষ, বহু বচনে (আলকাব) তা থেকে (বিকৃতিতে)' আলকাব', বা 'আলকাপ' শব্দ হতে পারে। আলকাপ নামে কোন আভিধানিক শব্দ আরবীতে নেই তবে 'আলকাহাপ' নামে শব্দ আছে, যার অর্থ মাথার খুলি। এছাড়াও শ্রী অরূন চৌধুরী স্বাধীনতা (২১ শে অক্টোবর-১৯৬২) লিখেছিলেন, কাপ কথাটি সংস্কৃত'কল্প' থেকে এসেছে, বলে ডাঃ সুকুমার সেন যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আমি সেটাই প্রহণীয় মনে করি। তিনি লিখেছেন নাট্যগীতিতে ও যাত্রার নাচে পাত্র-পাত্রীর ভুমিকায় সাজ করার ও সঙ সাজার নাম ছিল 'কাচ' (কৃত্য) বা 'কাপ' (কল্প) (দ্রষ্টব্য-বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯)। অন্য দিকে অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল, 'কাপটা' শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ ঠাট্টা তামাসা। 'আল' এর অর্থ সুক্ষ্ম মুখ, শব্দটি সংস্কৃত 'অল" শব্দথেকে উদ্ভুত।

শ্রী অরুন চৌধুরী আরও উল্লেখ করেছেন, 'আলকাপ শব্দের অর্থ অন্যের ভূমিকায় সাজসজ্জা করা। মধ্যবর্তী 'কাট' শব্দ অর্থহীন ভাবে এসেছে। আলকাপে সঙই মুল। সঙ-এর মধ্যেই একটা বিদ্রুপাত্মক ভাবে অনেক সময় থাকে। তবে সব সময়ে থাকে কি? 'নিমাই সন্ন্যাস' নামক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেও সঙ হয়। সেটাকে কি বলব?

শ্রী অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'স্বাধীনতা' পত্রিকা (২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬২), 'আলকাপ' প্রসংগে লিখেছিলেন, "আলকাপ কথাটি অভিধানে পাওয়া যায় না ঠিকই তবে, 'আল' এবং 'কাপ' দুটি শব্দই অভিধানে পাওয়া যায়। 'আল' (সংস্কৃত আল অর্থাৎ সুক্ষ্ম মুখ থেকে উদ্ভূত) কথাটির মানে জ্ঞানেন্দ্রমোহনদাস বলেনঃ হুল 'কন্টক হুল' (পৃ. ১৫০)

তুলনীয় ঃ লাটুর আল। 'কাপ' সংস্কৃত 'কপট' অর্থাৎ (কাপট্য থেকে উদ্ভূত), মানে ঃ কৌতুক, বাজী, তামাসা ঠাট্টা। (ঐ পৃঃ ৪৯৫)। অতএব অর্থটা দাঁড়াচ্ছে' হুল ফুঁটিয়ে ঠাট্টা তামাসা' অর্থাৎ ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে দিযে হুল ফোটানো। 'আলকাপ'কে মুর্শদাবাদ অঞ্চলে 'আলকাটাকাপ' ও বলে। 'কাটা' অর্থে বিদ্ধ করা, ধরলে (তুলনীয়ঃ সাপে কাটা), দ্বিতীয় অর্থটাই গ্রহণীয় বলে মনে হয়। 'এটি পরিপূর্ণতা অর্থেও ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বর্তমান আলকাপের শব্দে তার সম্পর্ক আবিস্কার করা যায় না। অতীতে এটি সাধারণভাবে পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। বর্তমানে যে কোন সাম্প্রতিক ঘটনাকে আশ্রয় করে আলকাপ গান রচনা করা হয। যারা আলকাপ গানের সাথে যুক্ত তাদের মতে 'আলকাপকে ভেঙ্গে অর্থ করলে, আল অর্থ চুড়ান্ত এবং কাপ অর্থ রস অর্থাৎ চুড়ান্ত রসের গান। আলকাপ গানের দু'টি অংশ গান ও ছড়া। ভারতী' পত্রিকায় শ্রী অবনীকুমার রায় লিখেছেন, 'জঙ্গীপুরের কথা'। এই লেখাটি কয়েকটি সংখ্যায় চাপা হয়েছিল। 'জঙ্গীপুরের লোকসংগীত' প্রসঙ্গে আলোচনা কালে (৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ সাল) শ্রী অবনীকুমার রায় লিখেছেনঃ "লোকসংগীত সবদেশের প্রাণশক্তি। প্রাচীন ভারতের সেই বৈদিক যুগ থেকে লোকসংগীতই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। দেশের উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা সংকীর্ণ হলেও সেকালে অভিনয়, কথকথা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ যে শিক্ষা লাভ করেছে, জীবন চলার পথে তা 'তাদের দিয়েছে অনুপ্রেরণা, জাগিয়েছে তাদের কর্মশক্তি।

আলকাপ গানের যে দুটি অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম অংশে সাধারণভাবে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক অথবা কোন লৌকিক গান রং-পাঁচালি পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় অংশে ছড়ায় ছড়ায় রঙ-পাঁচালি পরিবেশন করা হয। গম্ভীরা গানের বরং একটা মাধুর্য আছেঁ, কিন্তু আলকাপ নিতান্তই কুরুচিপূর্ণ এবং যৌনরাগ-রঞ্জিত (অনেকটা খেমটা গান- নৃত্যের সহচর)। অনেক ক্ষেত্রে সে গান ভদ্র-সমাজে পরিবেশনেরও অযোগ্য। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত জাগ গানেরও এটি বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, রাত্রি জেগে যে গান করা হয়, তাই-ই জাগ। যেমন,

বনে কানুর বাঁশী বাজিল রে।
সুর ও সোহাগে মন মাতিল রে।
পুলকে পুলকে উথলিয়া প্রেমে গদগদ হ'ল হিয়া
মরমে শরমে আকুল প্রাণে।
আমার মনে ঘন ঘন বাজিল রে।

বাংলা লোক সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন " আলকাপ গান ক্রম অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ ছড়া ও তারপর রঙ-পাঁচালিতে পরিণত হইয়াছে। রং পাঁচলি নিতান্ত লৌকিক সুরের লঘু রচনা, ছড়ার ধর্মই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। বস্তুর দিক দিয়া ইহাতে ধর্ম কিংবা সুগভীর কোন বিষয় থাকে না, সমসাময়িক কোন কৌতুককর ঘটনা ইহার উপজীব্য হয়। সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহাদের মধ্যে হইতে কোন কাব্যগুণ আশা করা যায় না। রং তামাসাই ইহার লক্ষ্য "(ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১১)। "তাঁর আরও ধারণা,"'আলকাপ' গানের যে অংশটি বর্তমানে ছড়ার রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা মুলতঃ যে গুরু বিষয়ক আখ্যান গীতি বা পাঁচালি ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত আলকাপ গানের ছড়াটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। রাধাকৃষ্ণ কিংবা রামসীতা বিষয়ক আখ্যায়িকা-গীতিগুলি অনুসরন করিয়াই পরবর্তীকালে তর্জার আকারে ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে। বর্তমানে আলকাপ গান পায় লুপ্ত হইয়া ছড়াই প্রচার করিতেছে।" ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এর বর্ণিত ছড়াটি নিম্নরূপ ঃ

রাধার উক্তি –

আমি ভরা যমুনাতে পার হব কি মতে
বসে বসে তাহা ভাবি।
মাঝি হে ওহে মাঝি
তোমা বিনে, ভাই, পার করবার কেউ নাই
অস্ত যাচ্ছে সন্ধ্যা রবি॥

কৃষ্ণের উক্তি -

চড়, কন্যা, নৌকা পরে হাল ধরিব শক্ত করে
ভয় ক'রোনা রাজার কুমারী।
চার বৈঠা বাইয়া জোরে পৌছে দিব ঐ পারে
বল বল, কন্যা, কি নাম তোমার হে।

রাধার উক্তি -

নামটি আমার রাধা রাণী সখা আমার ছিল জ্ঞানী
হারাইলাম বিজন বিপিনে
মাথাতে তার চূড়া ছিল সখা আমার কোথায় গেল
যাব আমি সেই খানে হে।

কৃষ্ণের উক্তি-

শোন শোন রাজ নন্দিনী, তুমি আমার ধ্যানের ধনী
হারাইলাম বনের মাঝারে।
দেখা তোমার পাব বলে চলে এলাম নদীর কুলে
বসে আছি মাঝি রূপ ধরে হে॥

রাধার উক্তি-

প্রিয় তুমি কি কারণে ফেলে আসলে বিজন বনে
সত্য করে বল তাই আমারে
ষোলো শ' গোপনীর কথা মনে পড়েছিল সেথা
তাইতো বুঝি ফেলে এসছিলে হে।

কৃষ্ণের উক্তি-

শোন বলি রাজ নন্দিনী তুমি আমার প্রেমের খনি
রাধা নামটি সকলের উপরে।
তাইতো তোমার মাথায় করে বেড়াই কলি দ্বীপেতে
বসে আছি নদী কিনারে হে॥
সিরাজদ্দৌলা বলে যুবতীর দলে
তোরা কৃষ্ণ ভক্ত হবি।
আমি ভরা যমুনাতে পার হব কি মতে
বসে বসে তাহা ভাবি॥
(ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১১।

এই গানটি ভারতের পশ্চিম বঙ্গ মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কবির ভণিতা আছে 'সিরাজদ্দৌলা' বলে। ইনি নবাব সিরাজদ্দৌলা কিনা জানা যায় না। তবে আলকাপ গানের এলাকা যে রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বর্ণিত আলকাপ গানে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আলকাপ গান লোক সমাজের সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তনের সাথে রূপান্তরিত হয়েছে। রূপান্তরিত আমাদের লোক নৃত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় এখানে উল্লেখ করা হলো। এরই আলোকে আমাদের নৃত্যবিদগণ ইচ্ছে করলে অনেক নৃত্যগীতের সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন যে কোন উৎসবও অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে' ধান কাটা নৃত্য, মাছ ধরা নৃত্য, 'শাপুড়ে নৃত্য ইত্যাদি গীতিনৃত্য প্রদর্শিত হয়।

বাংলার 'ব্রতচারী' নৃত্যের প্রচলন করে স্বর্গীয় গুরু সদয় দত্ত এক শ্রেণীর লোক নৃত্যের উদ্ভাবন করেন, যা এককালে আমাদের সুধী মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। উপস্থিত বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দের অবগতির জন্য তার একটু নমুনা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে বলে আমি মনে করছি।

"চল কোদাল চালাই
ভূলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ হবে
শরীর ঝাঁলাই।
চল কোদাল চালাই॥
হত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই। ইত্যাদি॥"

এটি শ্রম গীতি ও নৃত্যের মধ্যে পড়ে। আলকাপ গানের সাথে মিল রেখে এরূপ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বাংলাদেশের 'সুখী সমাজ তথা রূপসী বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলন জোড়দার হতে পারে।

গত ১০/৭/১৯৯২ইং তারিখ থেকে ১৭/৭/১৯৯২ইং তারিখ পর্যন্ত নোরাড প্রকল্পের আওতায় বাংলা একাডেমীর ফোকলোর বিভাগের তৎকালীন পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান এর তত্ত্বাবধানে, জনাব মফিজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী, সহ-পরিচালক, জনাব মুর্শিদ আনোয়ার, আলোকচিত্র শিল্পী জনাব মোহাম্মদ সাইদুর, সংগ্রাহক প্রদর্শক, সমন্বয়ে গবেষক দল গম্ভীরা ও আলকাপ গানের তথ্য সরেজমিনে অনুসন্ধান করেন। এধরণের সরকারী উদ্যোগ সম্ভবতঃ এটাই প্রথম। এ অনুসন্ধানের কারণে আমরা আলকাপ গান সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। সম্ভবতঃ গত ১৫/৭/১৯৯২ইং তারিখে চাঁপাই নবাবগঞ্জের ছত্রাজিতপুর তহসিল অফিস প্রাঙ্গণে আলকাপ গানের অনুষ্ঠান, বাংলা একাডেমী থেকে নোরাড প্রকল্পের আওতায় গবেষক দলের সক্রিয় সহযোগিতার ভিডিওতে ধারণ করেন মুর্শিদ আনোয়ার। সেখানে যারা গান পরিবেশন করেছেন তারা হলেন-শ্রী দ্বিজেন সরকার, কালু, হাকিম, আয়েস উদ্দিন, ফকির আলী, বদিউজ্জামান, পঞ্জু (ছোকরা), দিলিপ কুমার (ছোকরা), ছাত্তার, এরফান আলী, দিপু, আতাউর রহমান। বদিউজ্জামানের পরিচালনায় এই আলকাপ গান পরিবেশিত হয়। দেশীয় কথায় আলকাপ গানকে খেমটা গান বলা হয়। আসর শুরুর আগে খেমটা গান হয়। প্রথমে আসর বন্দনা করা হয়। তারপর খেমটা এবং তারপর আলকাপ গান শুরু করে। আলকাপ গান হিন্দু শাস্ত্রীয় গান। পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে এই গানের উৎপত্তি। মালদহ জেলার শিবগঞ্জ

থানার মোনাকসা গ্রামের বোনা-কানার নিকট থেকে এই গান চাঁপাই নবাবগঞ্জে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বৃটিশ আমলে বোনা-কানা এই গান নবাবগঞ্জে নিয়ে আসেন। নবাবগঞ্জ আগে মালদহ জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। পাকিস্তান আমলে রাজশাহী জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। ১০০ বছরের আগে এ আলকাপ অত্র এলাকায় প্রসার লাভ করে। ছত্রাজিতপুরে এই গানের প্রথম সরকার হচ্ছেন গফুর মিয়া। পরবর্তীকালে আবুল খায়ের মন্ডলের নেতৃত্বে এই গান এই এলাকায় প্রচার ও প্রসার লাভ করে। আবুল খায়ের প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ বছর এই গান করে গেছেন। আলকাপ গান বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এক সময়ে জমিদারগণ আলকাপ গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। গানটাই ছিল জমিদারদের ১৩/১৪ জন লোককে পোষতে হতো, পালতে হতো তখন জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্তমানে এই গানের কোন পৃষ্ঠপোষক নেই। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এখন সাহায্য সহযোগিতা করেন না। আগের দিনে এবং বর্তমানেও এই গান শোনার জন্য বিপুল লোকের সমাবেশ হয়। গফুর মিয়া শখের গান আলকাপকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতেন। তিনি সবসময় একটি গাড়ি রিজার্ভ করে রাখতেন দলকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তখনকার দিনে সারারাত জেগে মানুষ আলকাপ গান শুনত। বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা, ছেলে-বুড়ো আলকাপ গান শোনার জন্যে সমবেত হতো।

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে আলকাপ গানের আসরের ব্যবস্থা হচ্ছে শুনে মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য দর্শক-শ্রোতা ছত্রাজিতপুর তহসিল অফিস প্রাঙ্গনে ভীড় জমায় কারণ। এখনো যে এই গান জনপ্রিয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। চাল, ডাল, টাকা চাঁদা দিয়ে গ্রামের জনসাধারণ এখনো এই গানকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। পূর্বে বহু দল ছিল। বর্তমানে রাজশাহীর চাপাইনবাবগঞ্জে ছাত্রাজিতপুর, মোনাকষা ভোলাহাট ও পালশা এই চার জায়গায় আলকাপ দল আছে। আসর বন্দনা দিয়ে এই আলকাপ গান শুরু হয় যেমন, জয় সরস্বতী কি জয়, জয় শিব সর্বদেবতার জয়, জয়, দলের জয়, জয় বাংলাদেশের জয়। ছত্রাজিতপুরে এই দলের সবচেয়ে পুরনো শিল্পী হচ্ছেন আয়েস ঘোষ। বয়স ৭০। ছোকরার নৃত্য দিয়ে প্রথমে গান শুরু হয়। ছোকরা নারী সেজে গান করে। ছোকরা যখন বাঁকা চোখে "চেয় না বন্ধু হয়ে যাব খুব- ও মনে লাগল আগুন" কথা বলে গান শুরু করে তখন দর্শক-শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যায়। নাচের ভঙ্গি, কথার ভঙ্গি, পারফরমেন্স বা গানের পরিবেশন দেখে দর্শক-শ্রোতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। গানসহ এই ছোকরারনৃত্য আলকাপ গানের একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় দিক।

"ও আমার দিওয়ানা . . .
তুমি একটু ভেবে চল"

সময় হলে ফুটবে বন্ধু প্রেমের মুকুল গানসহ খেমটা বা ছোকরা নৃত্য হয়। এরপর মূল আলকাপ গান শুরু হয়। এই পর্যায়ের বন্দনায় এলাকার বিভিন্ন ফসল, জনজীবনের ছবি, ধান, পাট, রেশম চাষ, আম চাষের বিবরণ, প্রাকৃতিক বিবরণ, ঋতুর বিবরণ, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন তুলে ধরা হয়।

তোর তুলনা বিশ্বে গো মা
খুজে নাহি পাই
যদি তুমি না থাক পাশে মরণে
কি আছে জীবনে আমার
তুমি আছ সবই আছে ভুবনে আমার
তুমি নাই কিছু নাই ব্যথারই পাহাড়

এই গানটি আধুনিক গানের সুরে ও ঢং-এ পরিবেশিত হয়। আয়েস ঘোষ কলি যুগের বিবরণ দেন। ছেলেমেয়েদের পোশাকের বিবরণ দেন, ধুমপান সম্পর্কে বলেন।

রাজমিস্ত্রী ও ছুতারের মধ্যে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে গান গাওয় হয়। "রাজমিস্ত্রী বড়, না ছুতার বড়" এই নিয়ে দুইজনের মধ্যে পাল্লা বা তর্ক হয়। ছত্রাজিতপুরে পরিবেশিত আলকাপ গানের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য সর্বস্তরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। তহসিল অফিস প্রাঙ্গনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেক দর্শক-শ্রোতা গাছের ডালে এবং বিল্ডিং এর ছাদে বসে গান উপভোগ করেছে। এখানে যে আলকাপ গান পরিবেশিত হয় তাকে একটি জগাখিচুড়ি গান বলা যেতে পারে। ছোকরা নৃত্য বা খেমটা নাচসহ প্রচুর হিন্দী গান আলকাপ গানে ঢুকেছে। নৃত্য ও গানে, হিন্দী প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট এই গানের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষের রুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এই গানের উদ্দ্যোক্তা ও শিল্পীগণ এ ধরণের নৃত্য ও গানের ব্যবস্থা করেছেন বলে মনে হয়। এখানে স্বাভাবিকভাবেই লোকসংগীতের গতিশীলতা প্রমাণিত হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন পরিবেশে আলকাপ গান টিকিয়ে রাখার এটি একটি প্রচেষ্টা। আগের দিনের বিষয়বস্তুর সংগে বর্তমান কালের আলকাপ গানের বিষয়বস্তুর পার্থক্য হিন্দি গানের প্রভাব বেড়ে চলছে।

আলকাপ গান বিলুপ্তির কারণ

হিন্দু শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকের অভাবে বর্তমানে লোকজ সংস্কৃতির আলকাপ গান বিলুপ্তির পথে। মৌলবাদ ও সম্প্রদায়িকতার কারণে অনেক হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে যায়। হিন্দুপাড়া না হলে গানের রিহার্সাল দেয়া যায় না। বিত্তশালী ও আধিপত্যশালী শ্রেণী একে অশ্লীল গান মনে করে এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করে না। মুসলমানগণ আলকাপ গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু বর্তমানে করেন না। আলকাপ গানের বিষয়বস্তুঃ **পৌরাণিকঃ** কাহিনী রামের বনবাস, বিশ্বামিত্র পদ্ম, মনসা মঙ্গলের কাহিনী, রামায়ন মহাভারতের কাহিনী, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি। **ঐতিহাসিকঃ** গৌড়ের রাজা, আকবর বাদশা, জাহাঙ্গীর, সম্রাট শাজাহান, তাজমহল, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি। **সামাজিকঃ** ধনীচিত্র, গরীবের কাহিনী, কিভাবে শোষণ করা হয়, বৈষম্য অত্যাচার, নীপিড়ন গানে তুলে ধরা হতো। **আন্তর্জাতিকঃ** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বড় বড় ছড়ার আকারে আলকাপ গানে তুলে ধরা হতো। বাংলাদেশে ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা সমাজদেহে প্রবেশ করে। ফলে আলকাপ গান নিরুৎসাহিত হয় এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

উপসংহার

উত্তরাঞ্চলের জনপ্রিয় এই আলকাপ গানটি ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের পট পরিবর্তনের পর বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করে যাত্রার সাথে আলকাপ গানকে এক ঘরে করে রাখার ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তারপর ও কিছু উদ্যোগী আলকাপ শিল্পী লোকজ সংস্কৃতির তথা উত্তরাঞ্চলের জনপ্রিয় আলকাপ গানের লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার লোকজ সংস্কৃতির উপর আরোপিত বিভিন্ন বিধি নিষেধ তুলে দিয়েছেন যার দরূন আলকাপসহ বিভিন্ন লোকজ গানের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির সংগে এই আলকাপ গানের যে একটি নিবিড় সম্পর্ক এককালে ছিল, সেই সম্পর্কের কথা জানা যায়। আলকাপ গানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা

পাওয়া যায়, এই গানে লোকনাট্যের উপাদান আছে। আবার এ গানের বিরুদ্ধে অশ্লীলতারও অভিযোগ আছে। আলকাপ গান নিয়ে আরো গভীর, বিস্তৃত ও অনুপুঙ্খ গবেষণা কাজ হতে পারে।

পরিশেষে গীতিনৃত্যে আলকাপগান এখনও স্বমহিমায় টিকে আছে এবং থাকবে। নতুন যে কোন পরিবেশে নতুন পরিস্থিতিতে আলকাপ নতুনভাবে টিকে থাকবে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে যে কোন গান স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয় অথবা নতুন পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নতুনভাবে আত্ম প্রকাশ করে। এসব দিক বিবেচনা করে আলকাপ গান সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি বলে মনে হয়। লোকজ সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বর্তমানে এইগান রূপান্তরিত রূপে পাওয়া যাচ্ছে। আলকাপ গান নিয়ে আরো বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমান সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই গানের মধ্যে কি কি পরিবর্তন এসেছে বা কি রূপে এটি টিকে আছে এইসব বিষয় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করা যেতে পারে। প্রতি বছরের মত এবারও বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন মাসব্যাপী লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব' ২০০১ গত ৩রা ফেব্রুয়ারি '২০০১ ইং তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। মাসব্যাপী এই মেলা ও উৎসবে অন্যান্য লোক সংগীতের সাথে আলকাপ গানের অনুষ্ঠান ও সেমিনার কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এবার চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে আগত জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের যে আলকাপ দল এসেছিল। তারা গত ১৬/২/২০০১ইং তারিখে ফাউণ্ডেশনের লোকজ মঞ্চে আলকাপ গান' পরিবেশন করেছে। উপস্থিত দর্শক/শ্রোতাগণ এ আলকাপ গানে হাসি তামাসার মাঝে বিমুগ্ধ হয়েছেন। ফাউন্ডেশন থেকে গৃহীত এ পদক্ষেপ আলকাপ গানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে কিছুটা হলেও সক্ষম হবে। বর্তমান গনতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর লোকজ সংস্কৃতির লুপ্ত প্রায় বিভিন্ন গান সহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নিয়ে বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অতি সম্প্রতি অভিনয় আইনসহ সকল বিধি নিষেধ তুলে দিয়ে লোকজ-সাংস্কৃতি অঙ্গনের দ্বার উন্মোচিত করেছে। নিঃ সন্দেহে এটি একটি উল্লেখ যোগ্য অবদান। লোকজ গীতি নৃত্য আলকাপ গানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সরকারী বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, ১ম-২য় ও ৩য় খন্ড। (১ম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৫৪, ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩ ও ৩য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫)।

২। মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ১-২, ঢাকা, ১৯৬৮।

৩। গুরু সদয় দত্ত, দি ফোক ডান্স এন্ড ফোক সঙস অব বেঙ্গল, মর্ডাণ রিভিউ, জুলাই, ১৯৩২।

৪। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুর মার ঝুলি, কলিকাতা, ১৩২৯।

৫। সৈয়দ মাহবুব আলম, লোকশিল্প-১৯৯৯।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোক সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯০৭।

৭। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বুদ্ধিষ্ট মিষ্টিক সঙস, করাচী, ১৯৬০

৮। শহীদুল্লাহ, নবী করিম হযরত মুহম্মদ (দঃ), ঢাকা, ১৯৭৫।

৯। শহীদুল্লাহ্ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই, ট্রাডিশনাল কালচার ইন ইষ্ট পাকিস্তান, ঢাকা ১৯৬৩

১০। হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোক সংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮৯/১৯৮২।

১১। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের লোকশিল্প, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন ১৯৮৩।

১২। শফিকুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশের লোকসংগীত, বাংলা একাডেমী-১৯৯৪।

বাংলাদেশের মেলার সাজসজ্জা ঃ ঐতিহ্য ও রূপান্তর

জসিমউদ্দিন

মেলার সাজসজ্জা প্রসঙ্গে আলোচনায় আসার আগে মেলা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন।

গ্রামবাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে সারা বছর কোন না কোন উপলক্ষ্যে হাজার হাজার মেলা বসে। আমরা যেমন বাঙালী মেলাও তেমনি বাংলার। যুগ যুগ ধরে এই ভূখন্ডে বিভিন্ন ঘটনা, কিংবদন্তী, ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মেলা বসে আসছে।

মেলার অর্থ খুজতে আমরা পেয়েছি নানান উত্তর। আমাদের দেশের ৩ বছরের একটি শিশু ও মেলার অর্থ বুঝতে পেরেছে তবুও একাডেমিক পর্যায়ে বলা যায় যে, মেলার প্রচলন সব দেশেই আছে। আবহমান কাল থেকে মানুষ ইচ্ছা শক্তি বলে একসাথে মিলিত হয়ে আসছে। একসাথে ভোজনোৎসবে মিলিত হওয়ার রেওয়াজ থেকেই মেলার সূত্রপাত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়ে মেলার আয়োজন করতো কোথাও কোন পীরের নামে, সাধকের নামে, কোথাও কোন দেবতার নামে, কোথাও কোন তীর্থস্থানের নামে মেলা বসে। মেলার নামকরণ ও হয়ে থাকে তাদের নামের সঙ্গে। কোন কোন মেলায় আমোদের প্রয়োজন থাকে। কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, যাত্রা, নৃত্য-সঙ্গীতানুষ্ঠান, ম্যাজিক ও ভেল্কী এসব আনন্দপ্রদ বিষয়ও মেলার একটি আকর্ষণ।

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দ কোষে এ 'মেলা' শব্দের অর্থ লিখেছেন মিলন, সমাগম মূল ধাতু মিল্। আবার অন্যত্রে আছে, পর্বাদিতে বা উৎসবে বহু লোকের সমাগম; তাদৃশ লোক সমাগমউপলক্ষে বাজার। এইসব মিলিয়েই মেলা যার স্বাদ কেবল এই বাংলাদেশে। প্রত্যেকটি মেলার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ জায়গা যেখানে ঐ লোক

সমাগউপলক্ষে বাজার বসে থাকে। বাংলাদেশের মেলার এ এক বিশেষত্ব। আর কোথাও মেলা এমনভাবে বহু মানুষের জীবিকার সঙ্গে জড়িত নয়। বাংলাদেশের মেলার মতো সংযুক্তি আর কোথা ও নেই। বাংলাদেশের মেলা মানে বিশেষ বিশেষ জায়গার মেলা। যে জায়গাকে বাদ দিলে মেলার তাৎপর্যই যাবে হারিয়ে। কেননা মেলা বাংলাদেশের লোক উৎসব। ঠাকুরদেবতা বা তিথি, পার্বণ, ওরশ, ঈদ, আশুরাসহ বিভিন্ন উৎসব শুধু নয়, মেলা আরো বড় কিছু। এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে নাই বা করলাম। মেলার মাধ্যমে সবারসঙ্গে মেলামেশা করা ও আনন্দের ভুবন তৈরী করা, তাকে অর্থবহ করে তোলার মধ্যে মেলার মৌলিক রূপটি বিদ্যমান। আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে মেলা সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছি। মেলায় সম্পৃক্ত থেকেছি, মেলার আয়োজন করেছি এবং অনুধাবন করেছি যে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মেলায় থাকবে বর্ণিল সাজসজ্জা, নানা জাতের হস্তশিল্প, কারুশিল্প, কৃষিজাত পণ্য সহ দৈনন্দিন চাহিদা মোতাবেক পণ্যের সমাহার, বেচাকেনা, নাচগান, হাসিতামাশা, খেলাধূলা ইত্যাদি।

মেলার কোন না কোন উপলক্ষে আছে। এর মধ্যে কোনটির ধর্মীয়, কোনটির সামাজিক সাংস্কৃতিক কোনটির অর্থনৈতিক পটভূমি আছে। ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক পটভূমি যাই থাক না কেন প্রত্যেক মেলার রয়েছে যথাযথ সাজসজ্জার বর্ণিল পরিবেশ। বাংলাদেশের মেলা প্রসঙ্গে আরও কিছু না বললে বিষয়বস্তু অনেক অপূর্ণ থেকে যাবে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) আধুনালুপ্ত বাংলাদেশ হস্তশিল্প বিপণন সংস্থা এবং বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন এই তিনটি সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মেলা সম্পর্কে জরিপ পূর্বক বেশ কয়েকটি তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা করেছে। সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাগুলি ছিল গত দর্শকের এইসকল পর্যালোচনায় জানা যায় সারাদেশে বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট ১০০৫টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র বৃহত্তর ঢাকা জেলায় ছোটবড় ১৪১টি মেলার নাম পেয়েছি। নিম্নে সাধারণ ধারণার জন্য কিছু কিছু মেলার বিবরণ দেয়া হলো-

বাংলাদেশের বিভিন্ন মেলা অনুষ্ঠানের নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কারণগুলি পেয়েছি-

১। হিন্দু পর্ব

২। মুসলিম পর্ব

৩। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব বিশেষভাবে বড়দিনের উৎসবগুলিতে গ্রাম পর্যায়ে মেলাঃ যেমন ঢাকার আড়িখোলা এলাকা, নোয়াখালীর সোনাপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, বৃহত্তর বরিশালের বিভিন্ন গ্রাম।

৪। বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মেলা যেমন বৈশাখী 'পূর্ণিমা, আষাঢ়ি পূর্ণিমা, বৌদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি সময়ের সমাগমে মেলা যেটা বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে হয়।

৫। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণের মেলা এধরণের একটি বৃহত্তম মেলা চট্টগ্রামের জব্বরের বলি খেলার মেলা।

বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের মেলা, বৃহদাকার মেলাগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য এ দেশের কোথায় কখন কোন মেলা অনুষ্ঠিত হয় এরজন্য লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের মানচিত্রের সঙ্গে মেলার চিহ্ন সম্বলিত একটি চমৎকার নক্সা প্রণয়ন করেছে। বিসিক বাংলাদেশের মেলা নামে একটি তথ্যভিত্তিক বই প্রকাশ করেছে। মেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ রূপ রেখার ধারণা, সুনির্দিষ্টভাবে তেমন নেই। আজ মেলার

একটি উল্লেখযোগ্য দিকমেলার সাজসজ্জার বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ইতোপূর্বে মেলা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কারণগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ যাই হোক যে কোন মেলা একটি স্বতস্ফুর্ত সার্বজনীন সামাজিক ঘটনা। সকল ধর্ম, সকল বর্ণ, সকল গোত্রের মানুষ যুগ যুগ ধরে মেলায় আসছে, বেচাকেনা করছে, আনন্দ উল্লাস করছে।

মেলার সাজসজ্জার বর্ণিল ঢং এর সঙ্গে এই মানুষগুলো তাদের পোষাক, তাদের বাহারী অলংকার একাকার । তারাও মেলার সাজসজ্জার একটা অংশ।

মেলার সাজসজ্জা

ইতিহাসপূর্ব সময়ে সাধারণ মানুষদের যে সাজসজ্জা ছিল তা ছিল নেহায়েত ধর্মবিশ্বাস, প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলানো, হিংস্র জন্তু জানোয়ার থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য। মোটকথা তাদের সাজসজ্জা ছিল অনুকরণ বা ইমিটেশন কেন্দ্রীক। তাদের প্রতিটি উৎসব, সম্মিলন, জন্ম, মৃত্যুর বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় সাজসজ্জা ছিল একটি প্রধান বিষয়, যা আমরা প্রাগৈতিহাসিক গুহা চিত্রগুলিতে দেখেছি। লাসকো, আলতামিরাসহ ইতিহাসপূর্বে যে সমস্ত গুহা চিত্র আবিস্কার হয়েছে তার মধ্যে উৎসব, সম্মিলন, আনুষ্ঠানিক শিকার, ভোজ, ইত্যাদির চিত্র দেখে সেকালের সাজসজ্জা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সে সময়ের সাজসজ্জায় পশুর চামড়ায় অলংকরণ করা, গুহা সমূহের দেয়াল মসৃণ করে তাতে প্রাকৃতিক খনিজ রং যেমন রঙ্গীন মাটি, পশুর রক্ত, গাছের পাতার রং এবং পশুর চর্বির মিডিয়ায় ছবি আঁকা হত যেটা তাদের অনুষ্ঠান উৎসবের মূলকেন্দ্রের। তার মধ্যে ছিল সহজাত সৌন্দর্য ইলিউশান বা মায়া ছিল প্রাকৃতিক সহজাত রূপ, রং।

সকল যুগে মেলা অনুষ্ঠানের স্থানকে অসাধারণ সৌন্দর্য মন্ডিত করা হত

মধ্যযুগে যে যে স্থানে মেলা বসতো সে স্থানের একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা করতো আয়োজকগণ। সেকালের মেলায় হাতী, ঘোড়াসহ গৃহপালিত পশু থেকে শুরু করে কাপড়, অলংকারসহ প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী পাওয়া যেত। স্থান ছিল বড় নদীর তীর, নৌযানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য। সকল কালেই মেলার স্থান নির্বাচন করা হতো নদীর তীরে। পাহাড়ের কোল ঘেষা মসৃণ উপত্যকায় কিংবা উল্লেখযোগ্য কোন বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় মেলার কেন্দ্রের দিকে নৌকায়, গরুরগাড়ীতে মাঠ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে হাজার হাজার লোকের রঙ্গীন পোষাকে অলংকারে সজ্জিত হয়ে আসা যাওয়ার দৃশ্যই মেলার প্রধান দর্শনীয় বিষয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য নতুন ঘাট তৈরী করা হতো। আসা যাওয়ার পুরানো পথকে কেটে ছেটে যাতায়াতের উপযোগী করা হতো। মেলায় বিক্রির জন্য আগত পণ্যাদি সাজানোর জন্য শ্রেণী বিন্যাস একটি উল্লেখযোগ্য দিক যার ধারাবাহিকা আজও বিদ্যমান। যেমন পশু বিক্রির নির্ধারিত স্থানে তার ব্যবস্থা হতো, কাপড়ের জন্য নির্ধারিত স্থানে কাপড় বিক্রি করা হতো। পুরানো দিনেও আলোক সজ্জা ছিল, মশাল দিয়ে মেলার চারদিক আলোকিত করা হতো। মুঘল আমলে আমাদের দেশে মেলায় বিচিত্র সাজসজ্জার প্রভাব দেখা যায় বেশী। ঝালর, রঙ্গীন নিশান, বর্ণাঢ্য তোরণ ইত্যাদি সংযোজিত হতে থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে জাহাঙ্গীর নামায় উল্লেখ রয়েছে। তখনও মেলার মধ্যে আন্তর্জাতিক ছোয়া ছিল। বিদেশী সওদাগরগণ ব্যবসা

বাণিজ্যের প্রসারে মেলায় আসতো। সে সময়ে মেলায় ছিল সং, পাচালী, সঙ্গীত ও অভিনয়, আমোদ উল্লাসের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান' অর্থাৎ মঞ্চ তৈরী হতো। তেলের আলোক সজ্জার আলোকেই মঞ্চ আলোকিত হতো।

ধর্মীয় আচার কেন্দ্রিক যে সমস্ত মেলা ছিল বিশেষ করে হিন্দুদের পূজা অর্চনার স্থানকে সাজানো হতো রঙ্গীন কাগজের ঝালরে। মন্ডপে কাপড়ের সামিয়ানা থাকতো বিশাল আকারের। পুরু সামিয়ানা থাকতো বুটিদার কাজের এবং টুকরো কাপড়ের এপ্লিকের নক্সায় তৈরী। সকল সময়ে মেলায় একটি কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ছিল যেটা অনেকদূর থেকে দেখা যেত এক্ষেত্রে আদিম যুগের মেলায় টোটেমপুল ব্যবহৃত হতো এবং টোটেমপুলকে কেন্দ্র করে আরো আনুসাঙ্গিক সাজসজ্জা সংযোজিত হতো যেটা আধুনিক যুগের মেলায় টাওয়ার হিসাবে পরিচিত।

জমিদারী আমলে অভিষেক কিংবা বার্ষিক পূণ্যহকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মেলা বসতো তার সাজসজ্জা বিশেষভাবে কাচারী বাড়ী এর দহলিজ এবং বিভিন্ন চাতাল সাজানো হতো। কলাগাছের চারটি চারাপুতে কেন্দ্রভাগ তৈরী হতো তাকে ঘিরে আগত অতিথি বসতো যেখানে সমবেত হতো তার মেঝে উঠোন এবং প্যাসেজগুলিতে চালেরগুড়ো রঙ্গীন মাটি ইত্যাদি দিয়ে আলপনা আঁকা হতো। এই সময়ের সাজসজ্জার মধ্যে সরাসরি দেশীয়ভাব পরিস্ফুটিত হয়েছে। আলপনা করা রঙ্গীন কাগজের ঝালর। বিভিন্ন নক্সী ফুলের নক্সা সমন্বয়ে ঝালর, বুটিদার মখমল, রঙ্গীন গালিচা, নানান ধরণের নিশান ইত্যাদির প্রচলন শুরু হয়।

আঠারো শতকে সমগ্র ঢাকা ছিল এতদঅঞ্চলে প্রধান এলাকা। বৃহত্তর ঢাকাকে কেন্দ্র করে অনেক মেলা হয়েছে যা ছিল মুসলিম সংস্কৃতি কেন্দ্রীক। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা, যার সাজ সজ্জা ছিল বর্ণাঢ্য ঈদগা এর চারদিকে চাঁদ তারা খচিত নিশান রঙ্গীন ঝালর রংবেরং এর এপ্লিক সামিয়ানা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ আনন্দ মিছিল। এই মিছিলেও ছিল বর্ণাঢ্য নিশান ও ফেস্টুন। ঢাকা ছাড়াও সমগ্র দেশের বিভিন্ন ঈদগা এবং ঈদগাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মেলার সাজসজ্জা ছিল চিত্তাবর্ষক এবং বর্ণিল। শিয়া সম্প্রদায়ের মহররম বা আশুয়া উপলক্ষে ঢাকা শহরের হোসেনি দালানকে কেন্দ্র করে যে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তাজিয়া তৈরী, নকল দুলদুল, নকল ঢাল তলোয়ার এবং রঙ্গীন পোষাক, প্রতিটি এক একটি স্বতন্ত্র নক্সা বৈচিত্রের স্বাক্ষর এবং এ সমস্ত বিষয়াদি একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার বছর ধরে যে সমস্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে রথের মেলা অন্যতম। যেমন ঢাকার ধামরাইতে যে রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার জন্য যে বিশাল রথ তৈরী করা হয় তার সৌন্দর্য এবং কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরো বিস্তৃতির প্রয়োজন হবে। যাই হোক রথযাত্রা, রাস উৎসব, দোলউৎসব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে মেলা হয় তার সাজসজ্জা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের এবং ঐতিহ্যবাহী। তবে প্রতিটি মেলার সাধারণ সাজসজ্জার মধ্যে রয়েছে শিশুদের জন্য নাগরদোলা। এই নাগরদোলাও একটি বর্ণাঢ্য নক্সার নির্দশন। যার স্থাপনা এবং চালনা মেলার একটি অন্যতম আনন্দের খোরাক।

ইদানিং যে সকল মেলা হচ্ছে তার সাজসজ্জায় রয়েছে আধুনিকায়ন। সরাসরি পাশ্চাত্যের অনুকরণ। বিদেশী ঢংএ কাঠামো, মঞ্চ, টাওয়ার, আলোকসজ্জা ইত্যাদির স্থপনা তৈরী, চারদিকের বেষ্টনীকে সিনথেটিক দ্রব্যাদি দিয়ে সাজানো। কোন কোন ক্ষেত্রে

ক্যানভাসে বিচিত্র চিত্রের সমাবেশ ঘটানো। নিশান ওড়ানোর রেওয়াজ অবশ্য হারিয়ে যায়নি তবে পদ্ধতিগত এবং নক্সাগত দিকে আধুনিক ধাঁচ এসেছে।

রঙ্গীন আলোকসজ্জা বিদ্যুতায়িত সাজসজ্জা ইত্যাদির কারণে ঐতিহ্য গত দিক কিছুটা ম্লান হলেও আশার কথা যে বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকরপোরেশন বাংলা একাডেমি; জাতীয় জাদুঘর; চারুকলা ইনস্টিটিউটে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং উৎসব কেন্দ্রীক যে সমস্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয় তার সাজসজ্জার জন্য বাংলার নিজস্ব মোটিফের সমন্বয়ে নক্সার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরী করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবকে মডেল হিসাবে দেখা যেতে পারে।

বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবকে কেন্দ্র করে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় তার সাজসজ্জায় রয়েছে, একটি সুচিন্তিত ক্ল্যাসিক সংযোজন আধুনিক চিন্তা, আধুনিক স্থাপনা সবই রয়েছে তবে এর প্রতিটি ইঞ্চিতে আছে ঐতিহ্য লোকশিল্পের সাবলীল স্বাতন্ত্র্য ধারা। তাদের মেলা অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রত্যেক বছরেই হারানো ঐতিহ্যের খুজে পাওয়া বিষয়কে নতুন করে উপস্থাপন করা হয় যেমন মঞ্চ বর্তমানে যে মঞ্চটি আছে তার নক্সার মূলধারণা দিয়েছিলেন সৈয়দ মাহবুব আলম এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী আটচালা যা গ্রামীণ অবকাঠামোর নিদর্শন, সভ্রান্ত গৃহস্থের আটচালা ঘরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা উন্মুক্ত স্থানকে অবলোকনে এনে সঠিকভাবে বিভিন্ন স্থানপনাকে স্থাপন করা। যাতে করে মেলা চত্তরের সাধারণ প্রাকৃতিক শোভা। জলাশয়, তরুপল্লব, গাছ-গাছালির সৌন্দর্য্যকে কাজে লাগিয়ে অন্য কৃত্রিম সৌন্দর্য্য স্থাপন যেটি সাধারণভাবে অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অর্থাৎ স্টোসের ব্যবহার করা। এমনিতে সাধারণ মেলাগুলিতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শেড ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি দিয়ে অযথা স্পেস ঢেকে দেয়া হয়েছে। লোক মেলায় এ ক্ষেত্রে স্পেসকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। স্পেসকে কাজে লাগিয়ে সম্প্রসারণের ধারণাটি ১৯৯৯-এর মেলায় বর্তমান পরিচালক নিজেই উদ্ভাবন করেছেন। এরজন্য তিনি প্রসংসার দাবীদার। যেটা খুব সুক্ষ্ম এবং ক্লাসিক ধারণা না থাকলে করা যায় না। মেলার এ ধরণের সাজসজ্জা অন্ততঃ আমাদের দেশে প্রথম বটে। বর্তমানে অন্যান্য মেলাকে প্রভাবিত করেছে এভাবে ঐতিহ্য নিয়ে ভেবে সাজসজ্জার কাজ করা হলে অন্ততঃ এক্ষেত্রে হলেও আমাদের জাতিসত্ত্বার ধারক ঐতিহ্য নিয়ে জনমনে নতুন চেতনার সঞ্চার হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মেলার সাজসজ্জা প্রসঙ্গে কতিপয় সুপারিশ মালা

১। **বাংলাদেশের মেলাতে অন্ততঃ নিজস্ব কৃষ্টি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়ে কাজ করতে হবে।**

২। মেলার প্রবেশ পথ থেকে বাহির হওয়ার পথপ্রান্তের প্রতিটি দৃষ্টিকোণে স্বদেশী মোটিফ এবং গ্রামীণ জনগনের উদ্ভাবিত নক্সার মোটিফকে ব্যবহার করে চিত্রকল্প তৈরী করতে হবে।

৩। দেশীয় দ্রব্য সামগ্রীর সমন্বয়ে মেলার বিভিন্ন স্থপনা করতে হবে।

৪। প্রতিমেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে দেশের সাধারণ মানুষকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র সচেতন হওয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

রংপুরের শতরঞ্জি বাংলার নিজস্ব এক কারুশিল্প এবং এর ভবিষ্যৎ

মোঃ রবিউল ইসলাম

স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশ তার কারুশিল্পের জন্য গর্ববোধ করে আসছে। গ্রামের শিল্পী ও কারিগর তাদের চার পাশের প্রকৃতির সংগে একাত্ম হয়ে জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ জাত উপাদান দিয়ে কারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে।[১] কারুশিল্পের উৎপাদন কেবল একটা পৈতৃক পেশা নয়। এর পিছনে রয়েছে শিল্পীর সারাজীবনের সাধনা, ব্যবহৃত উপাদান সম্পর্কে রয়েছে তার সম্যকজ্ঞান, নিজের হাতের উপর আছে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, আর আছে এ সকল শিল্পকর্মে প্রচলিত নকশা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। সাধারণভাবে বললে নৈপুণ্য সমৃদ্ধ সুরুচিপূর্ণ, স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ কৌশলে ভাস্বর প্রধানতঃ হস্তনির্মিত বস্তু যা ব্যবহার্য বা নিছক সৌখিন উভয়রূপই হতে পারে, এমন সামগ্রীকেই কারুশিল্প জাত দ্রব্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[২]

লোক ও কারুশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রকৃতি ও পরিবেশ নির্ভর এর আকার গড়ণ, নকশার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে অনুসৃত প্রকৃতির অবাধ অফুরন্ত উপকরণের গড়ণ, বৈশিষ্ট্য নকশাকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতির উপকরণ ও উপকরণের নকশার চয়ন এবং লোকশিল্প , কারুশিল্প তৈরীতে অনিবার্য প্রয়োজন, ব্যাবহারের তাগিদ পরিবেশে মানুষের জীবন যাপন -সংস্কৃতির ধারায় নিহিত। তাই গ্রামের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ফসল লোক ও কারুশিল্প।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঁচামাল উপকরণ দিয়ে এদেশের মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে চলার, বাঁচার প্রয়োজনে নানা জিনিস বস্তু, শিল্প ও শিল্পকর্ম গড়ে, সৃষ্টি করে এদেশের বাঁশ, বেত, কাঠ, মাটি, ঘাস, ছন, তন্তু ইত্যাদি কাঁচামাল দিয়ে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যের জিনিস লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, বস্ত্রশিল্প।[৩] বসরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন

দেবদারু, বস্ত্র বয়নশিল্প তেমনি বাংলার নিজস্ব। বাংলাদেশকে বলা হয়ে থাকে বস্ত্র বা বয়ন শিল্পের জন্মভুমি। অধ্যাপক সুকুমার সেন বঙ্গ শব্দটির অর্থই করেন কার্পাস তুলা, আর বঙ্গাল মানে প্রচুর তুলা উৎপাদনকারী দেশ। প্রকৃতই বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্রের মতো খ্যাতি কোন দ্রব্যের কোন কালেই ছিল না। আর বাঙালীর এ খ্যাতি ও ঐতিহ্য তার প্রাপ্ত ইতিহাস অপেক্ষাও দীর্ঘায়িত। বাঙালীর আদি ইতিহাসের যে অধ্যায় তিমিরাচ্ছন্ন সেকালেও তার বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি স্বদেশ, এমনকি মহাদেশের সীমা অতিক্রম করে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধ্যাপক নিহারঞ্জনরায় বলেন" "বাংলাদশের বয়ন শিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্বেই দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহাই যে এদেশের প্রধান শিল্প তাহার পরিচয় পাওয়া যায় Pariplus Erythi mari নামক গ্রন্থে, আরব চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের ভ্রমন বৃত্তান্তের মধ্যে"। বাংলায় ধান চাষের মতই কার্পাসের চাষ ছিল সর্বব্যাপী। সেকালে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মেয়েরা কার্পাসের তুলা নিয়ে সুতা কাটতো সে সুতা থেকে তাঁতী সম্প্রদায় সমাজের প্রয়োজনে নানা প্রকারের বস্ত্র তৈরী করত। টেলরের বর্ণনা অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীতে অত্র অঞ্চলে ৩৬ প্রকারের সুতি বস্ত্র তৈরী হতো।[৪] এবং বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ উত্তম সুতি বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হতো। এ বয়ন শিল্পের মধ্যে মসলিন, জামদানী ও টাংগাইল, পাবনা ও ঢাকাই শাড়ী, খদ্দর শতরঞ্জি গালিচা, রাজশাহীর রেশম বস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশের সর্বত্র কমবেশী হিন্দু মুসলমান তাঁতীদের নিবাস এবং সর্বত্রই কমবেশী ভালো মন্দ কাপড়তৈরী হতো। তবে মোটা বা ক্ষোম বস্ত্র তৈরীতে উত্তর বঙ্গ ছিল প্রসিদ্ধ।[৫] সেই উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রংপুর জেলায় মুসলমান তাঁতীরা এক ধরণের মোটা কাপড় তৈরী করতো, যা "শতরঞ্জি" নামে পরিচিত।

শতরঞ্জি শব্দটি শতরঞ্জ শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। শতরঞ্জ শব্দটি ফার্সি ভাষার অর্ন্তভূক্ত। দাবা খেলার ছককে শতরঞ্জ বলা হয়ে থাকে এবং দাবার ছকের সংগে শতরঞ্জর নক্শার যথেষ্ট মিল থাকার কারণে শতরঞ্জি নাম করণে যথার্থতা রয়েছে।

শতরঞ্জি কি?

শতরঞ্জি বা ডুরি মূলতঃ এক প্রকার কার্পেট, যা সমাজের অভিজাত বা বিত্তবানদের গৃহে বিশেষ আসন হিসাবে পূর্বে ব্যবহার হতো। ইংরেজীতে শতরঞ্জিকে "Coarse striped cotton carpet" বলা হয়ে থাকে। অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফট বোর্ড? কর্তৃক প্রকাশিত" হ্যান্ডিক্রাফট অব ইন্ডিয়া প্রন্থে উল্লেখ আছে।

Durries are among the most inexpensive types of floor converings and yet they are colourful, useful and durable. Both patterned and plain carpets generally made of cotton though a small quantity of a more expensive variety is made in silk which lookes extremely rich and gloreus. Woolen durries are also made and they are very popular with people living in the colder regions. Durries either of cotton, silk or wool, are extremly attracted and useful as occasional rugs, picnic rugs and bivan

covers. They are often also used to cover the floor first before spreading valuable carpets. (page- 31)[৬]

উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শতরঞ্জি কার্পেটেরই একটি সংস্করণ, অর্থাৎ কার্পেট রূপান্তরিত প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উপকরণ কার্পাস তুলার সুতায় বোনা মোটা কাপড় যার ব্যবহার কার্পেটেরই অনুরূপ। অভিজাতদের গৃহে, বাংলো বাড়ীতে, খাজাঞ্জিখানায় শতরঞ্জির ব্যবহার পূর্বে দেখা যেতো। এসব স্থানে সাধারণ শতরঞ্জির উপর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বসার স্থানে মনোরম নকশায়, নানারঙের সুতার সংমিশ্রন তৈরী বৈচিত্র্যময় শতরঞ্জিতে বিশেষ বসার ব্যবস্থা থাকতো অর্থাৎ অভিজাত্যের প্রতিক ছিল শতরঞ্জি কারুশিল্প। এছাড়া এই কারুশিল্পটি প্রধানত মুসলমান তাঁতী সম্প্রদায়ের। সে প্রেক্ষিতে শতরঞ্জি কাপড়ে জায়নামাজ তৈরী হতো।

শতরঞ্জির ভৌগলিক অবস্থান

প্রবন্ধের শিরোনাম থেকে শতরঞ্জির ভৌগলিক অবস্থান স্পষ্ট প্রকাশ পায়। রংপুর বাংলাদেশের একটি পুরাতন জেলা। রংপুর জেলা শহরের সন্নিকটে নিশবেতগঞ্জ নামক গ্রামটিতে বৃটিশ শাসনামল থেকে শতরঞ্জি তৈরী করা হতো রংপুর জেলার ইতিহাস থেকে জানা যায় অতি পূর্বকালে রংপুরস্থ নিশবেতগঞ্জের শতরঞ্জি সমগ্র ভারত, বার্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রি হতো।

ভারতে বৃটিশ শাসনামলে ১৮৩০ ইং সালে মিস্টার নিশবেত নামে একজন বৃটিশ রংপুর জেলায় কালেক্টর ছিলেন। তিনি রংপুর শহরের সন্নিকটে পীরজাবাদ গ্রামে উৎপন্ন শতরঞ্জি দেখে মুগ্ধ হন এবং পরবর্তীতে তিনি শতরঞ্জির গুনগতমান উন্নয়ন ও শতরঞ্জি শিল্পের সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করেন। স্থানীয় পৌঢ় ব্যক্তিগণের মুখে জান যায় যে, এই বৃটিশ কালেক্টর মিষ্টার নিশবেতের নামানুসারেই তৎকালীন পীরজাবাদ মৌজার একাংশ নিশবেতগঞ্জ নামকরণ করা হয়। বংপুরে নিশবেতগঞ্জ ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোথাও শতরঞ্জি তৈরী হয় না।[৭] বিসিক, ডানিডা এবং কয়েকটি এন,জি ও প্রতিষ্ঠান এই শতরঞ্জি কারুশিল্প সম্প্রসারণের চিন্তা ভবনা করে ছিলেন সে প্রেক্ষিতে নোয়াখালী জেলার মাইজদি কোর্টে বিসিকের সহায়তায় ও ডানিডার অর্থায়নে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। সে প্রকল্পের অধীনে কিছু শতরঞ্জি তৈরী হতো, তবে এখন আর হয় না। এছাড়া লক্ষীপুর জেলার বাগবাড়ী থানা সদরে বিসিক অপর একটি শতরঞ্জি তৈরীর প্রজেক্ট চালু করে সেখানেও কিছু শতরঞ্জি তৈরী হতো এ ছাড়া রংপুরের সি, ও বাজারে আর্তের নামে একটি এন, জি ও সংস্থা শতরঞ্জি তৈরী প্রকল্প পরিচালনা করছে (তথ্য শতরঞ্জি শিল্পী আনোয়ার)।

বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শতরঞ্জি তৈরী হয় কিনা এ সম্পর্কে কোন Reference পাওয়া যায়নি। তবে অনাদিনাথ সিংহের "কুটির শিল্প ও পরিকল্পনা বইটির পৃষ্ট নং ১৩২ এ উল্লেখ আছে।। বাংলাদেশে বহুদিন থেকে ডুরি বা শতরঞ্জি বয়ন চলে আসছে কিন্তু বাংলার ডুরি বয়নকারীগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষ করে যুক্ত প্রদেশের ডুরি ও কার্পেট বয়নকারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। পশ্চিমবঙ্গের ডুরি ও কার্পেট শিল্পের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন। কলকাতার আশেপাশে অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক বর্তমানে এই শিল্পে নিযুক্ত" অনাদিনাথ সিংহের এই বক্তব্য অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে, তৎকালীন ভারতের যুক্ত প্রদেশে এবং কলকাতার আশে পাশে শতরঞ্জি বা ডুরি তৈরী হতো। বর্তমানে হয় কিনা আমার জানা নেই।

শতরঞ্জি কিভাবে কারুশিল্প জগতে এলো তা সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয়নি। এবনে গোলাম সামাদের মতে" শতরঞ্জি নামটি যেহেতু ফার্সি শব্দের অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু ধারণা করা যায় সুদূর পারস্য থেকে এই শিল্পটি এখানে এসেছে এভাবে-আমরা জানি যে, পারস্য উপমহাদেশ কার্পেট শিল্পের জন্য বিখ্যাত, হয় পারস্যের কোন কার্পেট শিল্পী পরিবার হয়তো উত্তর বঙ্গের এই রংপুর শহরে এসে বসতি স্থাপন করে অথবা বাংলাদেশের কোন কারুশিল্পী পারস্যে গিয়ে কার্পেট শিল্পে দীক্ষা পায় এবং সে ফিরে এসে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক তন্তু তুলার, সুতার তাঁতে শতরঞ্জি কারুশিল্প উৎপাদন করে পারস্যে কার্পেট তৈরীর কাঁচামাল সে অঞ্চলের প্রকৃতি নির্ভর অর্থাৎ ভেড়ার লোমের, বাংলাদেশে তা কার্পাস তুলার সুতায় বোনা। এখনে গোলাম সামাদের এ যুক্তিকে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। অর্থাৎ শতরঞ্জি একটি কারুশিল্প। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তর বঙ্গ মোটা ক্ষোম বস্ত্র তৈরীতে প্রসিদ্ধ ছিল। এই তথ্য অনুসরণে বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গে মোটা আটপোড়ে কাপড় তৈরী নিশ্চিত হলেও কি ধরণের মোটা কাপড় তৈরী হতো তা কোন রেফারেন্সে জানা সম্ভব হয়নি, তবে সৈয়দ মাহবুব আলম, উপ-পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে জানা যায় এ অঞ্চলের লোকেরা মুদ্রা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু বহনের জন্য মোটা কাপড়ের এক ধরণের থলে ব্যবহার করতো, এই থলে কোমরের সঙ্গে সুতা দিয়ে পেচিয়ে রাখতো, একে খুতি বলা হয়। থলেতে দুই তিনটি থাক অর্থাৎ ২/৩ টি পকেটে থাকতো। অত্যন্ত মজবুত ও মোটা কাপড়ের তৈরী হতো এই থলে এবং থলের উপরিভাগে মুখের কাছে ভিতর দিয়ে এমনভবে রশি পেচানো থাকতো যাতে রশিটি দুদিক দিয়ে টানলে থলেটির মুখ বন্ধ হয়ে যেত। থলেটির উপরিভাগে মুখের কাছে অর্থাৎ যেখানে রশি পেচানো থাকতো অন্য রঙের, বিশেষ করে লাল রঙের লাইনের মত জিডাইনের একটি রেখার ন্যায় মার্জিন বা লাইন থাকতো। থলেটির কাপড় সেভাবেই বয়ন করা হতো। এ তথ্য থেকে প্রমাণ করা যায় যে, মোটা কাপড়ের এই বয়ন শিল্প উত্তরা অঞ্চলে রংপুর জেলাতে ছিল, যা পরবর্তিতে শতরঞ্জিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, যেহেতু শতরঞ্জির উপাদান কাঁচামাল, এর নক্শা এর গঠন, এর বৈশিষ্ট্য একান্তই বাংলাদেশের জীবনধারায় বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যময়। বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ এখানে বসবাসরত মানুষের জীবনযাপনে, জীবন ধারার সঙ্গে শতরঞ্জি কারুশিল্প সম্পৃক্ত, সুতরাং তা এদেশের ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির উপাদান। অর্থাৎ শতরঞ্জি বাংলার নিজস্ব এক কারুশিল্প।

শতরঞ্জি তৈরীর প্রক্রিয়া এবং উপকরণ

শতরঞ্জি তৈরীর প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল এবং সহজ হলেও বৈচিত্র্যময়। সাধারণ হস্তচালিত তাঁতের মতই শতরঞ্জি বয়ন প্রক্রিয়া হলেও, শতরঞ্জি তৈরীর তাঁতের নির্মাণ কৌশল সাধারণ শাড়ী তৈরীর হস্তচালিত তাঁতের থেকে বিশেষ ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ শাড়ীকাপড় তৈরীর তাঁত ও শতরঞ্জি তৈরীর তাঁত এক রকম নয়। শতরঞ্জি তৈরীর তাঁত সাধারণতঃ ৪$\frac{১}{২}$ প্রস্থ অথবা যত প্রস্থের শতরঞ্জি তৈরী হবে তত প্রস্থের চেয়ে এক ফুট বেশী প্রস্থের দুই পার্শে দুইটি বাঁশের খন্ডের মধ্যে একটি বা একাধিক শতরঞ্জির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী দুরত্বের সুতা দিয়ে একবারেই টানা তৈরী করা হয়। দুই পার্শ্বের বাঁশ দুইটিতে

এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পেচিয়ে সুতা গুলো পাশাপাশি রেখে টানা তৈরী করা হয়। টানা তৈরীর এই বাঁশ দুইটির দুই প্রান্তে অপর দুইটি একই দৈর্ঘের বাঁশের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা থাকে এবং রশি বাঁধা বাঁশ দুইটির প্রান্তে অর্থাৎ চার প্রান্তে রশি টেনে চারটি খুটির সাহায্যে টানা দেয়া থাকে। অতঃপরবাঁশে সুতা পড়ানো টানার একপ্রান্ত থেকে শতরঞ্জি বুনন শুরু করা হয়। টানার যে প্রান্ত থেকে শতরঞ্জি বুনন করা হয় সে প্রান্তের টানা সুতার মধ্যে দুইটি ঝাঁপি সেট করা থাকে । টানার সুতার মধ্যে সুতা পড়িয়ে টানার প্রস্থমত দুইটি বাঁশের সঙ্গে পড়ানো হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে টানাতে বাঁশের সঙ্গে উপরে এবং নীচে দুই প্রস্থে পাশাপাশি সুতা পড়ানো থাকে। নীচের সারির সুতার সঙ্গে সুতা পড়িয়ে একটি বাঁশের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি ঝাঁপি তৈরী হয় অনুরূপ ভাবে টানার উপরের সারির সুতার সঙ্গে সুতা পড়িয়ে অপর একটি ঝাঁপি তৈরী করা হয়। ঝাঁপি দুইটি পাশাপাশি থাকে। টানায় আড়াআড়ি সুতা পড়ানোর জন্য পৃথক সুতার নলি তৈরী করা হয়। এই নলি হস্তচালিত তাঁতের মাকুর ন্যায় কাজ করে অর্থাৎ এই নলির সুতাই টানাতে আড়াআড়ি ভাবে তোলা হয়। এক সারি আড়াআড়ি সুতা তোলার পর ঝাঁপি পরিবর্তন করে দেয়া হয় আর্থাৎ উপরের ঝাঁপি নীচে এবং নীচের ঝাঁপি উপরে উঠানো হয়। ঝাঁপি দুইটি উপরে একটি বাঁশের দন্ডের সিলিং এ লাগানো থাকে। শতরঞ্জি তৈরীর কারুশিল্পীরা একে 'চালা' বলে। চালা বাঁশের সঙ্গে কামানের মাধ্যমে ঝাঁপির সংযোগ করা হয। প্রত্যেক ঝাঁপির দুই প্রান্তে, দুইটি রশির সাহায্যে দুইটি বাশের চালার মাধ্যমে সিলিং এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, একেই 'কামান' বলে। ঝাঁপি দুইটি যা সিলিং এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তা প্রয়োজন অনুসারে সামনে পিছনে সরানো যায়। টানায় এক সারি নালির সাহায্যে আড়াআড়ি সুতা পড়ানোর পর হাতের আকৃতির একটি পাঞ্জার সাহায্যে সুতাটাকে আরও Compact করে দেওয়া হয়। কাঠের বাটের সঙ্গে আংগুলের ন্যায় লোহার পাঁচ/ছয়টি পাত বা কোচ লাগানো যন্ত্রটিকে 'পাঞ্জা' বলে। শতরঞ্জিতে নকশা তোলার জন্য বিভিন্ন রঙের সুতার নলি কারুশিল্পীগণ ব্যবহার করেন। টানায় শতরঞ্জি বোনা শেষ হলে শতরঞ্জির প্রান্তদ্বয় বাঁশ থেকে ছড়িয়ে নেওয়ার পর দুই প্রান্তে সুতা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবেই পর্যায়ক্রমে একটি শতরঞ্জি তৈরী হয়।

উপকরণ

শতরঞ্জি তৈরীর মূল উপকরণ হলো সুতা এবং কিছু ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। প্রাচীন কালে অর্থাৎ পূর্বে যে সুতা শতরঞ্জি তৈরীতে ব্যবহার হতো তা ছিল কার্পাস তুলার, কিন্তু পরবর্তীতে সুতারদাম বেড়ে যাওয়ায় এবং সুতার তৈরী শতরঞ্জি আর্থিকভাবে লাভবান না হওয়ায় বর্তমান পাটের সুতায় শতরঞ্জি তৈরী হচ্ছে। ১২′× ২৪′ মাপের একটি ওয়াল ম্যাট তৈরী করতে সময় লাগে ১ দিন তার খরচ পড়ে ৭০০/- টাকা।

সুতা রং করণ ঃ শতরঞ্জির বৈশিষ্ট্য হলো নকশা তৈরীতে বিভিন্ন কালারের উজ্জল সুতার ব্যবহার শতরঞ্জি তৈরীর সুতার রংকরণ শিল্পীরা নিজেরাই করে থাকে। নকশার প্রয়োজনে বিভিন্ন কালারের সুতা শতরঞ্জি তৈরীতে ব্যবহার হয়ে থাকে। পূর্বে সুতায় প্রাকৃতিক রং বা ভেষজ ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে বাজারে পাওয়া সিনথেটিক রঙ ব্যবহার করা হয়। পাটের সুতাকে ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানি দিয়ে প্রথমে বয়েল করা হয়। বয়েলের সময় H_2O_2, সিলিকেট, কষ্টিক সোডা দেয়া হয়। বয়েলের সুতাকে পানিতে পরিষ্কার করার পর রংকরণ করা হয়। একটি চৌবাচ্চায় পছন্দ অনুযায়ী বাজারে পাওয়া সিনথেটিক

ডাইরেক্ট প্রুশিয়ন রং গোলানো হয়। উক্ত গোলানো রঙের মধ্যে সুতা ডোবানো হয়। রঙের মধ্যে কিছুটা লবন এবং সোডাও মিশানো হয়। চৌবাচ্চাতে রংকরণের পর পুনরায় পানি দিয়ে সুতা ধোয়া হয় এবং রোদে শুকানো হয়। এভাবেই কারুশিল্পীরা বর্তমানে সুতার রংকরণ করে থাকে।

শতরঞ্জি কারুশিল্পের নান্দকিক দিক এবং এর বিভিন্ন মোটিফের বিশ্লেষণ

মানুষ যেহেতু মনস্তাত্তিক সেহেতু তার অনুভব ও চেতনার প্রয়োজনে এবং উপযোগিতার নিরীখেই কারুশিল্প উৎপাদন করে। আর কারুশিল্প শুধু যে প্রয়োজনের নিরীখেই উৎপাদিত হয় তা নয় আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিস গুলোতে সৌন্দর্য্যের সোনার কাঠি ছুইয়ে তার জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে, শিল্পবোধকে বিকশিত করে। মানুষ যখন কিছু সুন্দরকরে গড়তে যায় তখন তার লক্ষ্য থাকে তার শিল্পবোধকে পরিতৃপ্ত করা। একারণে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোকে সৌন্দর্যমন্ডিত করবার চেষ্টা মানুষ করছে বিভিন্ন মোটিফকে এক সংগে সাজিয়ে নকশায় রূপ প্রদানের মাধ্যমে।[১২] শতরঞ্জি কারুশিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। কারুশিল্পীর শিল্পবোধ, কারুশিল্পীর সৌন্দর্যবোধ সময়ের সঙ্গে, কালের সঙ্গে বিভিন্ন মোটিফের সংযোজন বিয়োযনের মাধ্যমে শতরঞ্জিতে বিভিন্ন নকশার আবির্ভাব হয়েছে। এখনও বিভিন্ন নকশার শতরঞ্জি প্রস্তুত হচ্ছে। কালের বিবর্তনে অনেক মোটিফ হারিয়ে গেছে এবং মানুষের সৌন্দর্যে বোধের আপেক্ষিকতায় বিভিন্ন মোটিফের নবতর সংযোজন হয়েছে। শতরঞ্জি সবচেয়ে পুরনো যে মোটিফের নিদর্শন পাওয়া যায় তা হরো হাতির পা Elephant foot)। এই মোটিফের উল্লেখ Rangpur জেলা Gaggeter এ রয়েছে। এছাড়া ফুল, লতা, পাতা ও বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার আকৃতির নকশা দেখা যায়। বর্তমান কালে মসজিদের মিনার, খিলান, মাছ, নৌকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তির ছবির নকশাও শতরঞ্জিতে তোলা হয়। এসকল নকশার বিভিন্ন নামকরণও করা হয়। কোন স্থানের নামানুসারে যেমন ঘাঘট, আত্রাই, আখিরা, পাটগ্রাম , খুলনা, সিত্ত বাজার, পারবর্তীপুর, পিরগাছা, রংপুর চৌধুরাটী, পিতোপুর, গনেশপুর, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর, হারাগাছ, বোনার পাড়া, ফুলছড়ি ঘাট, পাবনা, ফূলবাড়ী, হিলি, বগুড়া, লালমনিরহাট, নগর বাড়ী, ঠাকুরগাঁ, শাহজাদপুর, সুন্দরবন, ঢাকা বরিশাল, চাপাই নবাবগঞ্জ, মহিমাগঞ্জ ইত্যাদি নকশার নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া নদীর নামেও কিছু নকশার নাম রয়েছে যেমন কর্ণফুলী, দুধকুমার, কীর্তিনাশা, পূর্নর্ভবা, নাফ, যমুনা, মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা, ধলেশ্বরী ইত্যাদি। ব্যাক্তির নামেও নকশার নামকরণ আছে যেমন, রাজ্জাক, লতা ইত্যাদি। নকশার এই নামকরণ শিল্পী তার পছন্দ অনুযায়ী দেন।

শতরঞ্জির বর্তমান অবস্থা

ভারত বিভক্তির পর শতরঞ্জি বিপণনের অসুবিধাও কাঁচামালের দুস্প্রাপ্যতার কারণে শতরঞ্জি শিল্পের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং শতরঞ্জি শিল্পে নিয়োজিত কারিগরগণ অন্য পেশায় নিয়োজত হয়। শতরঞ্জি শিল্পের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) পুনরায় রংপুরের শতরঞ্জি তৈরীর বিষয়ে উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) রংপুর জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ নিশবেতগঞ্জের শতরঞ্জি শিল্পের তথ্য জানতে পারে এবং

অনুসন্ধান করে কয়েক জন বৃদ্ধ কারিগরের নিকট থেকে শতরঞ্জি নমুনা দেখতে পায় বিসিক শতরঞ্জি শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য স্থানীয় ৪/৫ জন বৃদ্ধ শতরঞ্জি প্রস্তুতকারী কারিগর ও গণ্যমান ব্যাক্তিদের উৎসাহ ও পরামার্শ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে দামদর পুর গ্রামের হাজী আব্দুস ছালামের উদ্যোগে স্থানীয় কিছু ব্যাক্তিবর্গ ১৯৭৭ ইং সালে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নিকট লুপ্ত প্রায় ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পের পুররুজ্জীবনের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শতরঞ্জি শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাহায্যার্থে ১,৯০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করেন। এই অনুদানকৃত তহবিলের দ্বারা ১৯৭৭ ইং সালে রংপুরে জেলা প্রশসকের তত্ত্বধানে নিশবেত গঞ্জে একটি শতরঞ্জি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শতরঞ্জি প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই বিসিক প্রকল্পের কারিগরী সহায়তা প্রদান করতে থাকে। বিসিকের কারিগরি সহায়তার আওতায় অধিক সংখ্যক কারিগর সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩২ জন বেকার পুরুষ ও মহিলাকে পিটলুমের সাহায্যে শতরঞ্জি তৈরীর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, কিন্তু পিটলুমের সাহায্যে প্রস্তুতকৃত শতরঞ্জির গুণগতমান ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জির মত হয় নাই, সে প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সনাতন পদ্ধতিত্বেই শতরঞ্জি প্রস্তুত করা হয। এবং বর্তমানে সনাতন পদ্ধতিতেই শতরঞ্জি উৎপাদন হয়ে আসছে। ১৯৮১ সালে বিসিক শতরঞ্জি শিল্পের কারিগরী সমহায়তার জন্য ইউ, এন, ডি, পি এর টেক্সটাইল উপদেষ্টা বেলজিয়ামবাসী জে, জে হিউচেনের সহায়তা নেয়। জে, জে হিউচেন কটন সুতার পরিবর্তে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি পাটের সুতরী দ্বারা প্রাচীন পদ্ধতিতে শতরঞ্জি প্রস্তুতের পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী তুলনামুলক ভাবে কম মূল্যে ও গুনগতমান বাজায় রেখে বর্তমানে শতরঞ্জি প্রস্তুত হচ্ছে। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ইউ, এন ডি, পি নিশবেত গঞ্জের শতরঞ্জি প্রকল্পে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে।

১৯৮৩ সালে রংপুরের জেলা প্রশাসক শতরঞ্জি প্রকল্পের সার্বিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে শিল্পসহায়তা কেন্দ্র বিসিক রংপুরের নিকট ন্যাস্ত করেন। বিসিক "গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের" আওতায় এনে শতরঞ্জি উৎপাদন মুখী শিল্প প্রকল্প হিসাবে উৎপাদন করে আসছে। বিসিক কর্তৃক পরিচালিত শতরঞ্জি প্রকল্পের উৎপাদিত শতরঞ্জি বি, এইচ, এম, সি লিঃ, ঢাকা কারিকা, আড়ং প্রভৃতি রপ্তানী মুখী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট স্থানীয় এবং দুরবর্তী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের নিকট সরাসরি শতরঞ্জি বাজারজাত করছিল। তবে প্রকল্পটি লাভ জনক না হওয়ায় বর্তমানে জনৈক সেলিম নামে এক ব্যক্তিকে লীজ প্রদান করে প্রকল্পটি হস্তান্তর করে।

নিশবেতগঞ্জ শতরঞ্জি পাড়ায় এ বিষয়ে জরিপ কার্য্য চালানো হয়। এতে জানা যায় উক্ত পাড়ায় মোট ৭৪টি পরিবারের ১৫৫ জন কারুশিল্পী ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জিত, জায়নামাজ, ওয়ালম্যাট, পাপোষ ও উন্নতমানের ব্যাগ তৈরীর কাজ করছে। স্থানীয় অভিজ্ঞ মহল এবং কারু শিল্পীরা মনে করেন দেশে ও বিদেশে নিশবেতগঞ্জের শতরঞ্জি পাড়ায় উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা থাকা সত্বেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থ সংকট ইত্যাদির কারণে মাত্র ৯০ জন প্রত্যক্ষভাবে ঐতিহ্যবাহী এই পেশার সাথে জড়িত আছেন এবং অবশিষ্ট ৬৫ জন খন্ডকালীন ভাবে এর সহিত জড়িত।

প্রতিবেদকে শতরঞ্জি পাড়ায় জরিপ কাজের সময় তাঁতীরা জানায় যে, বিসিক কিছু দিন তাঁদের বিষয়ে খোজ খরব নিলেও, বর্তমানে তারা এই শিল্পের উন্নয়নে কিছুই করছে না বরং শতরঞ্জি প্রকল্পটি লীজ দেওয়ার প্রেক্ষিতে তারা মধ্য সত্ত্বভোগীর কবলে পড়েছে।

উক্ত লীজ গ্রহণকারী তার পছন্দমত শতরঞ্জি তৈরীর জন্য তাঁতীকে সুতা, টাকা ইত্যাদি দেয় এবং কম মূল্য প্রদানের বিনিময়ে শতরঞ্জি নিয়ে নেয়।

শতরঞ্জির বানিজ্যিক দিক এবং এ শিল্পের সমস্যা সমাধান

কারুশিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা ও সৌকর্য্য সাধনের জন্য প্রয়োজন সে শিল্প সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া, শিল্পীর কাজের স্বীকৃতিদান ও কারুপণ্যের বাজার সৃষ্টি করা। কোন ঐতিহ্যগত দ্রব্যকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তাকে যদি যুগপোযোগী করা না যায়, তাহলে তার বাজারে চাহিদা থাকবে না। Product life cycle দ্রব্যের জীবনে বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, যখন কোন দ্রব্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেতায় তার বাজার ধরে রাখতে পারে না, তখন দ্রব্যের পরিবর্তন ও ব্যবহার ভিন্ন করতে পারলে আবার সেই দ্রব্য নতুন অঙ্গিকে বাজারে এলে তার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। শতরঞ্জিরবেলায়ও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য[১২]। এছাড়া আজকের আধুনিক যুগের জীবন যাত্রায় কারুশিল্পের সকল ক্ষেত্রেই চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি দেশে মানুষের অজ্ঞতা, অবজ্ঞা, বস্তু সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানের প্রভাব, স্বল্প শ্রম ও ব্যয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহের বলয়ে কারুশিল্পজাত পণ্যের অন্তিম অবস্থায় রংপুরের শতরঞ্জির কারুশিল্পীগণ শতরঞ্জি তৈরী করে আজও জীবন যুদ্ধে টিকে আছে। লুপ্তপ্রায় এই কারুশিল্পটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। জরিপ কাজের সময় শিল্পীদের সংগে সাক্ষাৎকারে জানা যায়, বাজারজাতকরণ এশিল্পের উন্নয়নে একটি প্রধান অন্তরায়। এই শিল্পের বাজার খুবই সীমিত। ঢাকার কয়েকটি হাতে গোনা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্রাক, কারিকা আড়ং কারুপণ্য ইত্যাদিতে শতরঞ্জি শিল্পীরা শতরঞ্জি সরবরাহ করে থাকে। এবং বৈশাখী মেলা ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর বানিজ্য মেলায় এই শিল্পের প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া দেশের অন্যান্য শহরে শতরঞ্জির বাজারজাতকরণ হয় না বললেই চলে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এই শিল্পের জন্য অত্যন্ত সহায়ক বলে কারুশিল্পীরা মতামতদেন। শতরঞ্জির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এ শিল্পের নকশায় রঙের সংমিশ্রন, উপকরণের ভিন্নতার, উপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শতরঞ্জি কারুশিল্পে বৈচিত্র আনা গেলে এর বানিজ্যিকরণ বাড়ানো যাবে বলেও শিল্পীরা মনে করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমানে এই শিল্পটি মধ্যসত্বভোগীর কবলে পড়েছে। ব্যক্তিগ মালিকানায় লিজ নিয়ে জনৈক ব্যক্তি দরিদ্র কারুশিল্পীদের কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং ন্যায্য মূল্য থেকে কম মূল্য তৈরী শতরঞ্জি নিয়ে নেয় এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের আশুদৃষ্টির প্রয়োজন। শতরঞ্জির বিদেশেও চাহিদা রয়েছে বলে কারুশিল্পরা জানায়। কারুশিল্পীরা ইতিমধ্যে বিদেশী নাগরিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং বিভিন্ন এন, জি, ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নেদারল্যাণ্ড, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ কিছু দেশে শতরঞ্জি সরবরাহ করেছে। তবে তা খুবই সীমিতভাবে এক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারীভাবে সংযোগ রক্ষা করা যায় তবে বিদেশে বেশ কিছু শতরঞ্জি সরবরাহ করা যাবে শিল্পীরা মনে করেন।

শতরঞ্জি কারুশিল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে সুপারিশমালা

১। শতরঞ্জি কারুশিল্পের বাজার খুবই সীমিত। বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে শতরঞ্জির তথা দেশের ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি সেন্ট্রাল প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র তৈরী করা যেতে পারে। এটা ঢাকা অথবা সোনার গাঁয়ে লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনে হতে পারে।

২। পুঁজি এশিল্পের সম্প্রসারণে একটি অন্তরায়। এ পেশায় নিয়োজিত কারুশিল্পীরা অত্যন্ত দরিদ্র, তারা পুজির অভাবে উৎপাদন ব্যাপকভাবে করতে পারে না। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রয়াত্ব ব্যাংক এন, জিও প্রতিষ্ঠান, অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুজি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩। বাংলাদেশের শুধু একটি স্থানে এই কারুপণ্য উৎপাদন হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যদি শতরঞ্জি তৈরীর ব্যবস্থা করা যায় তবে এর উৎপাদন বাড়বে। এক্ষেত্রে ফাউণ্ডেশনের কারুপল্লীতে শতরঞ্জি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।

৪। এক সময় সামরিক বাহিনীতে বেডিং বাঁধার জন্য শতরঞ্জি সরবরাহ করা হতো। অনুরূপভাবে যদি সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় শতরঞ্জি কোন একটি পণ্য ব্যবহার করা যায় এক্ষেত্রে যেমন প্রতিবছর হজ্জ যাত্রীদের একটি শতরঞ্জির জায়নামাজ দেয়া হয় তবে শতরঞ্জির ব্যাপক চাহিদা বাড়বে।

৫। এই শিল্পের প্রধান উপাদান পাট এবং কার্পাসসূতা নায্যমূল্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সূতা সরবরাহ করা হলে শতরঞ্জির উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং এর উৎপাদন বাড়বে।

৬। কারুশিল্পীদের বিভিন্ন মোটিফ বিষয়ে ধারণা প্রদান এবং রং সংমিশ্রনে ও উৎপন্ন পণ্যের ব্যবহারের উপর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে এই শিল্পের সম্প্রসারণ হবে। সরকারীভাবে বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানে শতরঞ্জির উপর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ শেষে শিল্পীদেরকে শতরঞ্জি উৎপাদনের প্রয়োজনে কারিগরিও আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে।

৭। তরুণ ও কমদক্ষ শিল্পীদের উৎসাহিত করে শিল্প প্রকল্পের অধীন আনতে হবে এতে এ শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে এবং লোকশিল্পের ভূবন আরও সমৃদ্ধি হবে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনকে এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে হবে।

৮। দেশে বিভিন্ন মেলা ও উৎসবে আর্টিজান এ্যাটওয়ার্ক কর্মসূচীর মাধ্যমে এ শিল্পের শিল্পীদের এনে প্রদর্শন ও বিক্রির মাধ্যমে বাজার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৯। বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এই শিল্পের এবং শিল্পীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বিদেশে বাজার সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১০। বিদেশে বানিজ্য মেলায় শরঞ্জির কারুপণ্য পাঠানোর বিষয়ে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

১১। আমাদের দেশে এ পেশায় যারা নিয়োজিত তারা অবহেলিত সামাজিকভাবে তারা নিচু স্তরের রয়েছে। ফলে শিল্পীরা নিজেদের সন্তানদের অন্য পেশায় নিয়োগে আগ্রহী। এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে শতরঞ্জি শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে কারুশিল্পের কারিগরের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

১২। এই ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়। সে জন্য এ শিল্পের হৃতে গৌরব পুনরুদ্ধারে শতরঞ্জি কারুপণ্যকে আরও জনপ্রিয়

গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা চালাতে প্রয়োজনীয় গবেষণা করে এর সমস্যা চিহ্নিত করতঃ তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

১৩। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে দেশে বিদেশে কৃত্রিম আঁশের তৈরী বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদনে বিধি নিষেধ এবং অত্র এলাকার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবিশ্বে ক্রমাগত চাহিদার কথা বিবেচনা করে রংপুর বাংলাদেশের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রংপুর জেলার নিশবেতগঞ্জে "শতরঞ্জি শিল্প নগরী" প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সেমিনার-কারুময়ফ্রেমঃ বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় কারুশিল্পের এক নতুন উদ্ভাবিত সংযোজন সৈয়দ মাহবুব আলম, পৃষ্ঠা-২০

২। কর্মরত কারুশিল্পী-ডঃ এনামুল হক-পৃষ্ঠা-১০

৩। প্রাগুক্ত-২, পৃষ্ঠা-২০, ২১

৫। মোবাশ্বের আলী- বাংলাদেশের সন্ধানে-বাংলার প্রাচীন শিল্প-পৃষ্ঠা-১৮০

৬। খগেশ কিরণ তালুকদার-বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা-পৃষ্ঠা-৫৩

৭। ক) প্রাগুক্ত-৬, পৃষ্ঠা-৫৫

খ) A Handicrafts of India by All India Handicrafts Board-Page-31

৮। কুটির শিল্প ও পরিকল্পনা- অনাধিনাথ সিংহ-পৃষ্ঠা-১৩২

৯। তোফায়েল আহমেদ-লোকশিল্পঃ সঙ্গা ও পরিধি-পৃষ্ঠা-২০৭

১০। প্রাগুক্ত -৬, পৃষ্ঠা-৫৯

১১। Statistical Account of Bengal W W Hunter Page-304

১২। এবনে গোলাম সামাদ-ইসলামী শিল্পকলা-পৃষ্ঠা ১১৫

১৩। মোজাফর আহম্মদ সম্পাদিত ক্ষুদ্র গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা-পৃষ্ঠা - ২২৯

লোকজ খেলাধুলার সমাজতত্ত্ব

মোঃ খলীলুর রহমান

মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ এক সাথে বসবাস করে ক্রমান্বয়ে অধিকতর বৃহত্তরসমাজ গড়ে তোলে। মানুষের দলবদ্ধতার এই স্বাক্ষ্য মেলে ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজ-তত্ত্ব থেকে। মানুষের এই দলবদ্ধতাকেই সমাজ নামকরন করা হয়েছে। বাধতে গিয়ে সে দলকে টিকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন প্রকার রীতি–নীতি, নিয়ম-কানুন, আচার-আচরন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান। এগুলোর সমন্বয়েই মানুষ তার দলবদ্ধতাকে স্থায়িত্বদান করতে পেরেছে। গড়ে তুলেছে সমাজ। শ্রেনীভিত্তিক সমাজই হচ্ছে মানুষের আসল পরিচয়। সমাজ ব্যতীত মানুষ একটি সাধারন পদ মাত্র। হয় সে মুসলসান না হয় সে হিন্দু। হয় সে খ্রীষ্টান, না হয় সে বৌদ্ধ, হয় সে বাঙ্গালী না হয় বিহারী। এ থেকে বুঝা যায় মনুষ্য জীবনে সমাজের গুরুত্ব। মানুষের সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাঁচা, জীবিকা দ্বারা জীবন ধারন করা। এ জীবন ধারন পদ্ধতির ভিত্তিতেই সমাজ সংস্কৃতি সৃষ্টি।

সমাজ সম্পর্কে জিসবার্ট বলেন, "Society in general Consists in the complicated net work of social relationship by which every human being is interconnected with his fellowmen" সমাজ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তি সুযোগ পায় তার আপন অভিব্যক্তি প্রকাশনার যা কতগুলো রীতি নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ দল বা গোষ্ঠীগত ভাবে তার পুর্নজীবন অতিবাহিত করে সমাজে। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যার যার সমাজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। জীবন ধারনের তাগিদে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। যিনি যে সমাজের অধিবাসী তিনি সে সমাজের একজন পূর্ণ ও সার্থক সদস্য সেবক। সমাজ, সমাজের মানুষ, দল, গোষ্ঠী, তাদের আচার, আচরন, রীতি–নীতি, নিয়ম কানুন, প্রথা ব্যক্তি, ব্যক্তির পরিবার, সুখ, দুঃখ, বেদনা, হারজিত এবং তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সকল বিষয়ই সমাজতত্ত্বের অনুশীলন। এমন কি

সমাজের বিভিন্ন দল, শ্রেনী, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক, তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি, তাদের মিলন মিশ্রন এবং এতদ সর্ম্পকিত সমস্ত লৌকিক বিষয়াদি সমাজতত্ত্ব চয়ন করে। মানব জীবনের সম্পূর্ন এবং পূর্নাঙ্গ চিত্র, অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, জীবন ধারার ক্রমবিবর্তন পরিবেশ, নৃতত্ত্ব প্রকৃতি, আচার - অনুষ্ঠান ইত্যাদি সব বিষয় সমাজ তত্ত্বের আওতায়।

মানব সমাজের সকল রুপ, সকল রীতি - নীতি, প্রথা, আচার - অনুষ্ঠানের উৎকর্ষকে সংস্কৃতি বলা যায়। সামাজিক মানুষের ধারণা, ভাব বিশ্বাস ও কলাকৌশল এর অবিচ্ছেদ্য - সামগ্রিকতাই সংস্কৃতি। দৈনন্দিন জীবন ধারাকে কেন্দ্র করে দল বা গোষ্ঠীগত ভাবে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃতির। এই সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কখন ও সচেতনভাবে আবার কখনো অচেতনভাবে কাজ করেছে, কেন না জন্মের পর থেকেই প্রতিটি মানব শিশুকে সামাজিক পরিবেশে পালিত হতে হয়। সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যে দিয়ে শিশুর জীবন গড়ে উঠে। আর তাই বলা হয় A man is that a culture building animal" অর্থাৎ মানুষ সংস্কৃতি সৃজনশীল প্রানী।

সংস্কৃতি কথাটি এত ব্যাপক যে, একে কোন একটি মাত্রায় বা একটি দৃষ্টিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয় - দুঃসাধ্য। যা জীবন তাই সংস্কৃতি। মানুষ যে জীবন যাপন করে অর্থাৎ জীবন যাপন করার জন্য যা সৃষ্টি করে ঘর বাড়ী, খাট পালঙ্ক, পিঠা, পোশাক, ক্ষেতের আইল, নৌকা, পল্লবী এবং যা বিশ্বাস করে লক্ষী, স্বরসতী, সত্যপীর, সাত আসমান, বোরাক, বরাত, বায়েজীদ বোস্তামী, আল্লাহ্ রসুল, ভগবান, তার আচার অনুষ্ঠান, মাদলী ধারন, আল্পনা অংকন, মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সংগ্রাম, সংঘর্ষ, এবং তার আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য যে ভাষা, ইঙ্গিত, সাহিত্য ব্যবহার করে সে সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। কার্যের মধ্যে দিয়ে সে যে ঐতিহ্য তৈরী করে তাই তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। দেশের অধিকাংশ লোকসাধারনভাবে যে অভ্যাস চর্চাকরে তা সে দেশের সংস্কৃতির অংশ। মানুষের সৃষ্টি শক্তির পরিচয় মিলে তার সংস্কৃতিতে। এই সৃষ্টি শক্তির জন্যই মানুষ - মানুষ অন্য জীব থেকে স্বতন্ত্র। অন্য জীব প্রকৃতির বশ কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে। কারন মানুষগড়তে পারে, সৃষ্টি করতে পারে। যে কৃতি ও সহায়ে মানুষ - মানুষ, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী - তাই সংস্কৃতি।

শয়নে বসনে, আহারে বিহারে, অধিকাংশ লোক স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে যা অনুশীলন করে সেটাকে সংস্কৃতি বলা উচিত। সংস্কৃতি গতিশীল। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। যারা এটাকে বুঝতে না পেরে পুরনোকে আকরে ধরে রাখছে তারা ভুল করছে। পিতা যদি পুত্রের নিকট নিজের মুল্যবোধের পালা ও পুরণ প্রত্যাশা করে তবে তিনি ভুল করবেন। নিজের আদর্শ ও মুল্যবোধকে পুত্রের নিকট হস্তান্তরিত করে পুত্রের নিজস্ব বিকাশের পথ করে দেবেন। তাতে সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। তাই বলে সংস্কৃতির ভিত্তিকে অস্বীকার করলে চলবেনা। বিদেশের জিনিস আমরা নিব তবে নিজেদের পরিপুরক হিসেবে। বিচার বিশ্লেষন করে দেখতে গেলে সংস্কৃতির কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞা আছে বলে মনে হয় না। কোন একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ সম্মিলিত রূপায়নই ঐ জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলে অবহিত করা যায়। সুতরাং কোন জাতির সংস্কৃতি নির্নয়ের ক্ষেত্রে ভৌগলিক সীমারেখা ও সময় কালের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। উপরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি বিশ্লেষনে দুটিরূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি আত্মপ্রকাশ করে জাতির দৈনন্দিন জীবন ধারাকে অবলম্বন করে।

এক্ষেত্রে তার নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র, আসবাব, অশন, বসন, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি থেকে শুরু করে তার সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান, জন্মলগ্নে অনুষ্ঠিত লোকাচার, আকিকা, বিয়ে, বিয়ের বাজনা, বাসর জাগা এমনকি পরলৌকিক অনুষ্ঠান পর্যন্ত জাতির শিল্পরুচি ও সৌন্দর্য প্রীতি সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত। ধর্মে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লৌকিক রুপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন - বাংলাদেশের লোকজন হিন্দু বা মুসলমান যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মীয় ব্যবধান সত্ত্বেও সামাজিক অনুষ্ঠানে জাতীয় সংস্কৃতি বড় হয়ে দেখা দেয়। সংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারায় আমরা সমাজ বাসীর সাংস্কুতিক চেতনা ও জীবনবোধ অর্থাৎ তার কাব্য, সাহিত্য, সংগীত এবং চিত্রকলা ইত্যাদিকে বুঝতে পারি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতি তার সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেতন থাকে না। কারন সংস্কৃতি জীবন ধারনের অঙ্গ। মানব সমাজ অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবন চেতনায় বিশেষ করে জাতীয়তা বোধ উম্মেষের প্রয়োজনে মানুষ স্বসংস্কৃতি সচেতন হয়ে উঠে। যেমন হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝমাঝি ভারতবর্ষে এবং ১৯৫২ ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে। সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটে অনেক সময় বহিঃশক্তির প্রভাবে। কোন বহিশক্তি যখন কোন দেশ অধিকার করে তখন রাজশক্তির প্রভাবে বিদেশী আচার ব্যবহার মেনে নেয়া হয় এবং পরবর্তী কালে তাই বিজিত দেশের সংস্কৃতিতে রূপান্তর হয়। চাপ সৃষ্টি না করলে অবশ্য দীর্ঘদিনের সাহচর্যে বিজিত দেশবাসীর অজ্ঞাতে তাদের জীবন ধারা পরিবর্তিত হয়। যেমন মোগল প্রভাবে বাঙ্গালী উৎসবের খাদ্য পোলাও কোর্মা ও কালিয়ার উদ্ভব সঙ্গীত ও চিত্র বিদ্যায় পার্শিয়ান প্রভাব লক্ষ্যনীয়। এসব প্রভাব জাত আচারন আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনাচরন বা সংস্কৃতিতে রুপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কুতিক জীবনের পরিচয় দিতে হলে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সম্পর্কে অমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আমাদের ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করেছি বিদেশীদের বিবরন ও তথ্য থেকে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসকে ধরে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। বহুদিন আর্য সভ্যতার বাহিরে থেকে বাঙ্গালী নিজেদের এক বিশেষ পরিচয়ে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। আর্য সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দুরে নদ - নদী, অরন্য, সর্প, ব্যাঘ্র আর কুমীরের বিচরন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাদের সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়েছে। আর্য সংস্কৃতির মুল ভূখন্ড থেকে দুরে বিচ্ছিন্ন জীবন চেতনায় স্বতন্ত্র বোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল আর এ জীবন চেতনা ছিল প্রানচঞ্চল, গতিশীল এবং উদ্যাম। বাংলাদেশ বহুবার বহু বহিঃশত্রু দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। ফলে অধিকর্তাদের ধর্ম থেকে শুরু করে তাদের আচার আচরন পোশাক, পরিচ্ছদ সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সবই বিজিত জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর্য, বৌদ্ধ ও সেন আমলের সমাজের প্রতিচ্ছবির পরিবর্তন পাই মুসলিম আমলে। বাঙ্গালীও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে মুসলিম শাসনামলে আগত আউলিয়া দরবেশদের কারনে বাঙ্গালীর জীবনে পারসিক সংস্কৃতির ছাপ পড়ে। বিজয়ী মুসলমানরা এদেশের মানুষের ধর্মীয় রীতি গ্রহন না করলে ও করেছিলেন আচার - ব্যবহার, আহার - বিহার, সঙ্গীত শিল্পকলা, জীবন উপভোগের উপকরনকে। বাঙ্গালী মাছে ভাতে বাঙ্গালী। নবান্ন পৌষ পার্বন, পিঠা - পল্লবি, শালী ধানের খই আর গামছা বাঁধা দই, তার নবনর্ষ ১লা বৈশাখে পোশাক ও মস্তক অনাবৃত বাঙ্গালী বধুর কলসী মাথায় নয় কাঁধে। বাঙ্গালীর জারী গান, সারি গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী,কীর্তন, বাউলগান, গাজীর গান তার লৌকিক জীবনকে মুখর করে রেখেছে।

বাংলার নকশীকাঁথা, শিল্প নৈপুন্য শীতল পাটির নক্সা নমুনা, শিকার কাজ আর আল্পনার বৈচিত্র বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ। বাঙ্গালীর জীবন ধারন নীতি থেকে শুরু করে তার পানাহার লৌকিক উৎসব অবস্থায় সাহিত্য চিত্রকলা কুঠির শিল্প, শস্য ফলনের রীতি তার সাংস্কৃতিক সম্পদ।

বর্ণগোত্রের বিভিন্নতা ধর্ম ও জীবন ধারণ পার্থক্যতা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালী সমাজে আমরা মিল দেখতে পাই। মিল খুঁজে পাই আমরা বাঙ্গালীর আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রায় এক। হিন্দু সমাজের কিছু ধর্মীয় এবং আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে মুসলিম সমাজ গ্রহণ করেছে হিন্দু আচার, পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজ ও গ্রহণ করেছে মুসলিমাচার। নানা দিক থেকে নদ-নদী জলধারা যেমন সমুদ্রে মিলিত হয়েছে, সেরূপ নানা উপজাতির লোকেরা একত্রিত হয়ে বাংলার বিপুল জন সমুদ্রে মিশে গেছে। বাংলার সমতল ভূমি যেমন নদী বাহিত পলি দিয়ে গড়া তেমনি বিভিন্ন উপজাতির সহবস্থা বা সহযোগিতা আদান প্রদান ও আচার অনুষ্ঠান নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার লোক সমাজ ও লোক সংস্কৃতি। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের প্রান্ত সীমানায় পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় সাওতাল, ওরাও, রাজবংশী, গারো, হাজং, মনিপুরি, খাসিয়া, চাকমা, মুরং, টিপরা, কোচ, খুমী; সেন্দুজ প্রভৃতি উপজাতির লোকদের অনুষ্ঠানাদি ও লৌকিক রূপ ধারণ করেছে। এই আদিম উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকদের কাছ থেকে বাঙ্গালী সমাজ আচার অনুষ্ঠানের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাই বাঙ্গালীর আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে একদিকে যেমন দেখা যায় উপজাতীয় চিন্তা ভাবনা অপর দিকে দেখা যায় লৌকিক প্রভাব। এভাবে মিলন মিশ্রনের কাজ চলছে সদূর অতীত থেকে। এই মিলনের পথ ধরে সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙ্গালী আবদ্ধ একে অপরের কাছে। এমনি করে বাঙ্গালী সারা বিশ্বে এক ঐতিহ্যশীল সাংস্কৃতির ধারক।

বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও বিশটি উপজাতি একই ভৌগলিক পরিবেশে একই আবহাওয়ায় একই ঐতিহাসিক কাল পরিবেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী বসবাস করছে। একই আবেগে ধ্যানে ধারণায় অনুপ্রানীত হয়েছে, একই রকম আচার ব্যবহার, পূজা পার্বণ, দৈনন্দিন কাজ কর্মে অভ্যস্ত হয়েছে, একই রকম প্রাকৃতিক ও মানসিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে বিধায় সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা একে অপরের কাছ থেকে ভিন্ন নয় অভিন্ন। বাংলার সংস্কৃতি শেকড় সর্বপ্রাণবাদে প্রোথিত, অন্যান্য বিষয়ের মতো খেলাধুলার উৎপত্তি হয়েছে লোক সংস্কার থেকে। খেলার মধ্যে বাঙ্গালীর নিজস্ব ঐতিহ্য আছে।

সামাজিক জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষকে জীবিকার্জন, আত্মরক্ষার জন্য নিয়োজিত রাখতে হয়েছে। নিজের জীবন বাঁচানো এবং জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে মানুষ আয়ও করেছে বিভিন্ন রীতি ও কৌশল। উদাহরন স্বরূপ বলা যেতে পারে আদিম অরণ্যচারী মানুষ পশুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে পশু ও মৎস্য শিকার করে আহার্য্য উপকরণ সংগ্রহ করতো। এখন শিকার হবিতে পরিণত হয়েছে। কুস্তি ও লাঠি খেলা এক সময় আত্মরক্ষার অত্যবশ্যক উপায় ছিল। বৃটিশ রাজত্বের শোষন, শাসন ও ব্যভিচারে বাঙ্গালী যারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখন তারা বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে দেশের বহু লোককে কারা বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু এতে বাঙ্গালী জাতি দমেনি। তারা নানা উপায়ে বৃটিশ জাতিকে ব্যঙ্গ

বিদ্রুপ শুরু করে। এই লক্ষ্যে তারা ইংরেজ জাতির প্রতি মূর্তি গুড্ডি আকারে তৈরী করে নাকে, কানে ও কোমরে সুতো লাগিয়ে তা আকাশে উড়িয়ে গুড্ডির খেলা শুরু করে। দেখতে দেখতে এ খেলাটি অল্পদিনের মধ্যে সারাদেশ ব্যাপী প্রচলিত হয়। সারাদেশের আকাশে মানুষ ঘুড্ডি উড়াতে দেখে। অনেক অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে অকুতোভয় বাঙ্গালী এ খেলায় আত্মনিয়োগ করে। গুড্ডি খেলা লৌকিক রূপ ধারণ করে। তাই শুধু খেলার জন্য খেলার উৎপত্তি তা নয়, এর অর্ন্তনিহিত তত্ব হিসেবে রয়েছে আত্মরক্ষা এবং বাস্তবধর্মী ঘটনা প্রবাহ, এভাবে খেলার উৎপত্তি। অনেক খেলায় জড়িত রয়েছে প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রীতি, বিধি-বিধান, বিশ্বাস, ও আচার অনুষ্ঠানের স্মৃতি। জীবন রক্ষা ও জীবিকার্জনের নতুন উপায় উদ্ভাবনের সাথে সাথে এগুলো আনন্দ উপভোগের বিষয় অর্থাৎ চিত্তবিনোদন হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে।

লৌকিক খেলাধূলাকে আমাদের জীবন যাত্রা তথা জীবনের ঘাত ও প্রতিঘাতের দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে জাতীয় সমাজ জীবনে গ্রামীন খেলাধূলার গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী সকলেই শ্রমের অংশীদার। কারুর শ্রম খেলোয়াড় বা খেলার অংশীদার হিসেবে এবং কারুর শ্রম দর্শক হিসেবে। সকলের সমবেত শ্রম এবং অংশগ্রহন ব্যতীত কোন খেলা জমেনা। তবে খেলার শ্রমকে অন্যান্য শ্রমের সংগে তুলনা করা যায়না। কেননা এ শ্রমে ক্লান্তি নেই, আছে আনন্দ। এ শ্রমে অবসাদ আসে না, তৃপ্তির আমেজ। এই শ্রম শরীরকে সুগঠিত করে। তাই এ শ্রমের অভাবে মানব জীবন অনেকের কাছেই দূর্বিসহ।

মানুষের জীবনে ঘাত ও প্রতিঘাতের অন্ত নেই। এসব ঘাত প্রতিঘাত একটি সুদক্ষ খেলোয়াড়ের মত হাসিমুখে বরন করে নেয়া যায় একমাত্র খেলাধুলা থেকে। কেননা খেলাতে হারজিত আছে। একদল জিতবে একদল হারবে। এই হারজিত মেনে নিয়ে খেলায় অংশগ্রহন করতে হয় বলে মানসিক ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটে না। কোন কোন খেলার ভিতর দিয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানের চর্চা হয়। শ্রম, ধৈর্য্য, কৌশল, মস্তিষ্ক চালনা, সংখ্যা গননা থেকে শুরু করে, দেহকে বলিষ্ঠ, মনকে করে তুলে উদার ও নীতিবান জীবনে বয়ে আনে সুখ ও শান্তি, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের মধুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে তুলে। প্রতিটি খেলার মাধ্যমে মানুষ একতা, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা প্রভৃতি অর্জন করে। এই খেলাধূলার ভিতর দিয়ে বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষের সাথে পরিচয়ের যেমন সুযোগ ঘটে তেমনি বন্ধুত্বের পথ সুদৃঢ় হয়। তাই শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশে খেলাধুলা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিভুষিত।

বাঙ্গালীর নিজস্বখেলাধুলা বলতে লৌকিক বা দেশজ ক্রীড়াসমূহকে বুঝায়। এদেশে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ লৌকিক খেলাধুলা প্রচলিত আছে। এগুলো একদিকে যেমন আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে অণ্যদিকে তেমনি জাতির গর্বের বিষয়ও বটে। এসব খেলাধূলার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী জাতির নিষ্ঠা নীতিবোধ, জ্ঞান জাতীয় চরিত্রের সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ভাবমুর্তি প্রকাশ পায়।

লোকজ খেলাধুলা বাঙালীর বিশুদ্ধ খেলা। প্রাচীন কাল থেকে শরীরচর্চা, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিত্ত-বিনোদনসহ নবশক্তি ও উদ্যম সঞ্চার, অবসর সময় কাটানো, সৌর্যবীর্য ও কৌশল ভিত্তিক শতাধিক বিশুদ্ধ খেলার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের গ্রামীন লোকজ সমাজে লোকজ খেলার বৈশিষ্ট্যময় চমৎকার ভূমিকার কথা এদেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলের

কাছে জানা। এ সকল লৌকিক খেলা গ্রামীন জীবন ভিত্তিক নগর কেন্দ্রিক নয়। অর্থাৎ লোকজ খেলা গ্রাম্য সহজ সরল লোকের ঢিলে ঢালা প্রকৃতির, নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোর অনুশাসন উপেক্ষা করে লৌকিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের চার দিকের লোকজ পরিবেশ সহজ লভ্য মাটি, খড়, লাঠি, ইটের টুকরো সুতো, বাশের কঞ্চি, গুটি, পাট কাঠি বা সোলা, কড়ি, বীচি, গাছের ফল, লতাপাতা, পাখা, কাগজ, ধুলা বালি, কলাগাছ, নদীনালা, পুকুর, ডোবা, জল, স্থল ও আকাশ ইত্যাদিই হচ্ছে লোকজ খেলার উপাদান ও উপকরণ। এই সকল উপদান ব্যয়বিহীন। জাতীয় ইতিহাস রচনায় লৌকিক খেলোধূলার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই জল, স্থল অন্তরীক্ষে বাঙালী খেলার চর্চা করে আসছে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের খেলা সমুহ শিশু কিশোর, যুব-যুবতী এমনকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও খেলে থাকেন। শংকর সেন গুপ্তের পুস্তিকায় ঐতিহ্যগত লোকজ খেলাধুলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

১. সাঁতার ২. জলপুলিশ ৩. নৌকা বাইচ, ৪. পলো, ৫. হোল ডুগ ৬. লাই ৭. তই তই ৮. জল ঝুপ্পা ৯. ছিলকি. ১০. সিলকি ১১. পাশা ১২. তাস ১৩. হা-ডু-ডু ১৪. বাজী পোড়ন ১৫. বাঘ বন্দী ১৬. কানামাছি ১৭. লাঠি খেলা ১৮. ছোড়া খেলা.১৯. অসি খেলা ২০. গাছ পাতা চেনা খেলা ২১., লাফ খেলা ২২. দৌড় খেলা ২৩. মুরগীর লড়াই ২৪. ঝাপ. ২৫. খো-খো খেলা ২৬. দাড়িয়া বান্ধা ২৭. এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা ২৮. গোল্লাছুট ২৯. ড্যাং গুডি. ৩০ নুনতা ৩১. চিককা ৩২ ষোল গুটি ৩৩. কড়ি খেলা ৩৪. চামড়ি খেলা ৩৫ ছি-চত্তর ৩৬. আগডোম বাগডোম ৩৭. ঘুর্ণি খেলা ৩৮. রাজার কোটাল ৩৯. ব্যাঙের মাথা ৪০. বকছি ৪১. কড়ি খেলা ৪২ কবুতর উড়ানো ৪৩. বুলবুলির লড়াই ৪৪. ইকিড় মিকির ৪৫. রান্নাবাড়ি ৪৬. বউ বউ ৪৭. উবুদশ ৪৮. গাড়ী গাড়ী ৪৯. বাড়ী তৈরী ৫০. ঠাকুর চেনা ৫১. ইছন বিছন ৫২. তেতুল বীচি ৫৩. কাটাকাটি খেলা ৫৪. বাজী খেলা ৫৫. আংটি খেলা ৫৬. লুডু ৫৭. কাদা খেলা ৬৮. সমস্যা পূরণ ৫৯. বাও খেলা ৬৯. চাউল খেলা ৬১. গোলক দাম ৬২. আড়াই ঘর ৬৩. ঘরি বন্দি ৬৪. বুড়ি বুড়ি ৬৫. চোর ধরা ৬৬. কিৎ কিৎ ৬৭. তাল কাটি ৬৮. চোর পলান্তি ৬৯. বুড়ি বসান্তি ৭০ গুলি ৭১ গা ছোয়া ৭২. কুকুর শকুনি ৭৩. বন ভোজন ৭৪. লাই খেলা ৭৫. রুমাল চোর ৭৬. নৌকা ভাসান ৭৭. দেবভিনয় ৭৮. মাছ ধরা ৭৯. বলরাম ব্যায়াম ৮০. নষ্ট চন্দ্র ৮১. হোর বোল ৮২, গুলতি খেলা ৮৩ চাকা খেলা ৮৪. পুতুল খেলা ৮৫. আঙ্গুল খেলা ৮৬. সই পাতান খেলা।

উপরোল্লিখিত লোকজ খেলা ব্যতীত আরো কিছু খেলা ঐতিহ্যগত ভাবে গ্রামীণ জীবনে চর্চা হয়ে থাকে যেমনঃ ৮৭. কাঠাল বীচি খেলা ৮৮ কাছি টানাটানি খেলা, ৮৯. গাই গোদানি খেলা ৯০. ছাল ছ্যালি খেলা,. ৯১. নারিকেল খেলা ৯২. পালকি খেলা ৯৩. চুঙ্গরা খেলা ৯৪. চান্দা খেলা ৯৫ চিক্কা খেলা ৯৬. চিত্তরানি খেলা ৯৭. তুলিস তোল খেলা ৯৮. পোয়া পোয়া খেলা ৯৯. কুত্তা খেলা. ১০০. ছত্রিশ গুটি খেলা ১০১. কেজোড় খেলা ১০২. টুনি ভাইয়ের টুনি খেলা ১০৩. বত্রিশ গুটি খেলা ১০৪. মস কাড়া কাড়ি খেলা ১০৫. চাবডি খেলা ১০৬. চোখের পাতায় ফুদেয়া খেলা ১০৭. চিমটি কাটা খেলা ১০৮. ঢেকি ভানা খেলা ১০৯. তেলের গাছ ঘুরানো ১১০. নাক টানা খেলা ১১১. বানরের খেলা ১১২. বেজীর খেলা ১১৩. ভালুক নাচের খেলা ১১৪. মাকড়সার জাল খেলা ১১৫. ষাড়ের লড়াই খেলা ১১৬ কুস্তি খেলা ১১৭. দোক খেলা ১১৮ ঢেকি খেলা. ১১৯. বলী খেলা ১২০. টোপ ভাতি খেলা ১২১. জোড়-বিজোড় খেলা ১২২. চান্ডি খেলা

১২৩. পালান টুকটুক খেলা. ১২৪. ফাঁদ পাতা খেলা ১২৫. হাটি হাটি পা পা খেলা ১২৬. দুধা বা বাঘ বাঘ খেলা ১২৭ বাঘের চক্ষু দেখা খেলা ১২৮ পানিতে ধান নেড়ে দেয়া খেলা ১২৯. গরু দৌড়ের খেলা ১৩০. বাজিকর খেলা ১৩১. কুমির কুমির খেলা ১৩২. সাপের খেলা ১৩৭. ব্যাঙ লাফানো খেলা ১৩৮. বাইছালী খেলা ১৩৯. ঘুঘু সই খেলা ১৪০. ঘুদিলো ঘুঙ্গি খেলা ১৪১ নাউট্যা চড়ুই খেলা ১৪২. হাড়াইয়া বালুন্তই খেলা ১৪৩. ঢাপ বাড়ি খেলা ১৪৫ হাতে তাই দেয়া খেলা ১৪৬. মামা মামী ঢোলে খেলা ১৪৭. টুক্কাটুক্কি খেলা ১৪৮. ওপেন্টি বায়স্কোপ খেলা. ১৮৯ কাঠি ছোঁয়া ছুঁয়ি খেলা ১৫০. কইল্লা খেলা।

উপরোল্লিখিত লৌকিক খেলাধুলা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয। বৈচিত্রপূর্ণ গ্রামীন খেলাধুলা একেক অঞ্চলে একেক নামে পরিচিত। নরসিংদী অঞ্চলে যে সকল গ্রামীন খেলাধূলা রয়েছে তার বিবরণ মুহম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান রচিত নরসিংদীর লৌকিক খেলাধুলা নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন ঃ ১. আদা খেলা ২ হাসা হাসী খেলা ৩. বাগী নাচান খেলা ৪. ঢেং ঢেং খেলা ৫. ভিক্ষা খেলা ৬. বাত কর্মের শাস্তি খেলা ৭. আদা আদা খেলা ৮. মোড়া প্যাচানো খেলা ৯. জল কাড়াকাড়ি ১০. চাপিলা চুপিলা খেলা ১১.আঙ্গুল ভাজা খেলা ১২. টুকুনি মার বকুনি খেলা, ১৩. খাইয়্যা খেলা ১৪. চারতাস খেলা. ১৫ চরকি ঘুরানো খেলা ১৬ কাউয়া খেলা ১৭. বাগুন ভাজা খেলা ১৮. গাই-বাছুর খেলা ১৯. ফকির বা কাঠ বিড়ালী খেলা ২০. তিন কাঠি খেলা ২১. ডুব সাতার খেলা ২২. বল ডুই খেলা ২৩. ডুবা ডুবি খেলা ২৪. কালা পানি ধলা পানি খেলা ২৫. মাছ মাছ খেলা ২৬. আইকম বাইকম খেলা ২৭. দশ বিশ খেলা ২৮. নাটা গোটা খেলা ২৯. ধাপ্পা খেলা ৩০. দ্রুত উচ্চারণ কসরত খেলা ৩১. কথায় হারজিত খেলা ৩২. ফাক্কা ফুক্কা খেলা ৩৩. মেকা বুড়ি খেলা ৩৪. হাতের খেলার ৩৫. আড়ে গাছ ঘোরানো খেলা ৩৬. ঝুলন খেলা ৩৭. বুদ্ধিমান খেলা ৩৮. ছি বুড়ি খেলা ৩৯. ডুক্কু ডুক্কু খেলা ৪০. বিশ কাঠি খেলা ৪১. জোড় বিজোড় খেলা ৪২. হুটকী বাড়ি খেলা ৪৩. সিক্কা খেলা ৪৫. সাতচাড়া খেলা ৪৬. লাডুম ঝুলানি খেলা ৪৭. ভাব্বা খেলা ৪৮. শাক ভাত খেলা ৪৯. চগম খেলা ৫০. ফুল লানা খেলা ৫১. কাঠাল চুরি খেলা ৫২. ড্যাগার খেলা ৫৩. ঘিলা খেলা ৪৯. চগম খেলা.৫০. ফুল লানা খেলা ৫১. কাঠাল চুরি খেলা ৫২. ড্যাগার খেলা ৫৩. ঘিরা খেলা ৫৪. এক ছৈল্লা খেলা ৫৫. ঘোড় দৌড় খেলা ৫৬. মেড়ার পট খেলা ৫৭. খাম্বা খেলা ৫৮. পাইত খেলা ৫৯ বড় পাইত খেলা. ৬০ নয় গুটি খেলা ৬১. আক্কল বন্দী খেলা ৬২. বল্লম খেলা।

উপরোক্ত প্রতিটি লৌকিক খেলার সমাজ তাত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। এসকল খেলাধুলার তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষন করলে বের হয়ে আসে সমাজ চিত্রের আদি আসল রূপ। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলা, বাংলার জলবায়ু আঁকা বাকা নদ-নদী নদীমাতৃক বাংলাদেশ, ষড়ঋতুর বাংলায় আবহমান কাল ধরে বিশাল জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় বসবাস করার ফলে যে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরী করেছে তা পৃথিবীর অন্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যায়। স্থান ভেদে লৌকিক খেলাধুলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে।

জলের খেলা

নদী বহুল বাংলাদেশ। এই নদীবহুল দেশে আত্মরক্ষা ও জীবিকা অর্জন এই উভয়বিধ প্রয়োজনে নদ-নদী খাল-বিল ও পুকুরে ডুব সাঁতার জানা অপরিহার্য। ডুব সাঁতারে দক্ষ না হলে নৌকা ডুবি, লঞ্চডুবি, ডুবন্ত লোক বা নৌকা উদ্ধার, মাছ, ধরা, পানিতে পাটবাধান

কাটা, পাটের জাক দেয়া, পচানো পাট পানির নীচ থেকে উঠানো ইত্যাদি কাজ সম্ভব নয়। তাই বাংলার জনগোষ্ঠী লৌকিক খেলাধুলার মাধ্যমে জলকে নিজের আয়ত্তে এনেছে। ডুব সাঁতার খেলা, বেঙ্গ খেলা, লাই জলই খেলা, ডুবাডুবি, নৌকা বাইচ, মাছ মাছ, আবুর মার টাপুরটুপুর খেলা, চিল, হাঁস হাঁস খেলা, পলো খেলা, বাইছালী খেলা, ছুলছুল খেলা, জল ঝোপ্পা খেলা, হোল ভোগ খেলা, তই তই খেলা, উবুহু খেলা, কয়া খেলা, ঝাউলি খেলা, ঢিল ছোড়া খেলা, ছিলকী খেলা, ইত্যাদি জলের খেলা আবহমান কাল ধরে বাঙ্গালী চর্চা করে আসছে।

স্থলের খেলা

জমি দখল, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য মধ্য যুগে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হতো। যেমন ঃ লাঠি, সড়কি বল্লম ইত্যাদি। পরবর্তীতে এ সকল উপকরন খেলায় রূপান্তরিত হয। যেমনঃ লাঠি খেলা, সড়কি খেলা, বল্লম খেলা, কুস্তি খেলা, কুমীর কুমীর খেলা, এলাটিং বেলাটিং ইত্যাদি। এ সকল খেলায় কলা কৌশলের কোন বালাই নেই, আছে শক্তিমত্তা আর জবর দস্তি। এ সকল খেলায় সামন্তযুগের জোর যার মুল্লুক তার রীতি প্রতিফলিত হয়। সে যুগে সংঘটিত যুদ্ধ আত্ম সমর্পন ও বল প্রয়োগের ফলে বস্যতা স্বীকার প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠে।

কোন কোন খেলার ভিতর দিয়ে বুদ্ধির চর্চা জ্ঞানের চর্চা হয়। ধৈর্যের সহিত অনুশীলন সুচিন্তিত কৌশল অর্থাৎ মস্তিস্ক চালনা বিভিন্ন লৌকিক খেলায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন এক্কা দোক্কা, ষোল ঘুটি, দাবা এবং পাশা।

দাবা খেলার রীতি বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত আছে। ন-অবল খেলায় ঠাকুর মন্ত্রী ইত্যাদির উল্লেখ আছে। দাবা কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা, বাস্তব যুদ্ধের কৌশল ও রহস্য এতে প্রচ্ছন্ন। মুসলিম আমলে নারীর পাশা খেলার কথা পাওয়া যায়। সম্ভবত মুসলিম প্রভাবে দাবার স্থানে পাশা নিয়েছিল বলে ভাষা তত্ত্ববিদদের ধারনা। পাশা খেলা বিবাহের পর বরের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের পর ঘরের মেঝেতে বা উঠানে ১টি গর্ত করে পানি ভর্তি করে দেয়। বর এ গর্তে কড়ি বা আংটি লূকিয়ে রাখে বধু খুঁজে বের করে। আবার বধু লুকায় বর তা খঁজে বের করে। নতুন জীবনের শুরুতে ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্তে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাতে বধু জয়ী হলে লক্ষীবধু না সুগৃহিনী হবে বলে ধরণা করা হয়। বর হারলে দাদী নাতিরা অনেক তিরস্কার করে। পুরুষের উপর নারীর আধিপত্য এতে লক্ষ্যনীয়। প্রাচীন কালে বাসর শয্যাতে এ পাশা খেলা হত।

কাদা খেলা ঃ ফাগুন, চৈত্র ও বৈশাখে মাঝে মধ্যে প্রকট খড়া দেখা দেয়। লৌকিক পেশাদার কৃষক বৃষ্টির অভাবে কৃষিভূমি আবাদ করতে পারে না। তাই বৃষ্টি আহবানে কাদা খেলা অনুষ্ঠিত হয। অনেক সময় জামাই ষষ্টিতে কাদাখেলা হয়ে থাকে। বিবাহে কাদা খেলার প্রচলন রয়েছে।

অন্তরীক্ষের খেলা ঃ আকাশ পথে বিচরণ জ্ঞান থেকে বাঙ্গালী অন্তরীক্ষের খেলায় মেতেছে। অন্তরীক্ষের খেলার মধ্যে গুড়ি খেলা, পায়রা খেলা, বুলবুলির লড়াই, তুবড়ি, আতসবাজির খেলা, বেলুন খেলা, চোঙ্গা ইত্যাদিতে বাঙ্গালী সুপ্রাচীন কাল থেকে অংশগ্রহণ করে আসছে। অন্তরীক্ষের খেলা বিশ্লেষনে আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহ, সংবাদ পরিবেশন যুদ্ধের সময় আকাশ পথে আক্রমন ইত্যাদি তত্ত্ব পাওয়া যায়। এমন খেলায় বাজ পাখির মত দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা, ধৈর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি এবং গনিতের মত হিসেবের দরকার হয়।

বাংলাদেশের বিস্তৃত গ্রামীন পরিবেশ ও লোক জীবনে আবহমান কাল থেকে কোন কোন গ্রামীন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ কারী খেলোয়াড়দের খেলা শুরুর পূর্বে খেলোয়াড় বন্টনের পদ্ধতি অতি চমৎকার। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দু পক্ষে দুজন দলপতি নির্বাচিত হয়। অতঃপর দুজন করে খেলোয়াড় একত্রিত হয়ে, গোপনে নিজেদের ছদ্মনাম নির্বাচন করে। এই ছদ্মনাম গুলো সাধারণতঃ ফুল, ফল, লতা, পাতা, ঘাস, প্রজাপতি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। শুধু তাই নয় অনেক সময় ছড়ার মাধ্যমে ও এই ছদ্ম নামধারী খেলোয়াড় গনকে আমন্ত্রন করা হয়।

এজিদ ভেজিদ খেজিদ খা
পরজাপতি উইড়ে যা।
ইষ্টিশনের বিষ্টি ফূল
আয়রে আমার গোলাপ ফুল
(ময়মনসিংহ)

চন্দনের নাম দাদা
ইতির মিতির ফিতির খায়
প্রোজাপতি উইড়া যায়।
(যশোহর)

খেলোয়াড় বন্টনের পর খেলা শুরুর পালা আসে। খেলা তদারককারী যখনঃ

ইনডি, গিনডি, ছিনডি
বা
উটি,মুটি, ছুটি

এই ছড়া দুইটির যে কোন একটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলা শুরু হয়। খেলা খেলতে গিয়ে অনেক সময় দু-দলের মধ্যে মরামারির উপক্রম হয়ে যায়।

বিয়াল বিয়াল দুই পর
গাট্রা হাপ আজাগর
আজাগারের গা মোটা
গাট্রা হাপ পুট পুটা
হাপ মারি লেইঞ্চা বিষ
মোকদ্দমা টিস মিস (সিলেট)

এক পইসার তাগা
মহরদমা লাগা
এক পইসার কিসমিস
মহরদমা টিসমিস। (কুমিল্লা)

বৈচিত্রময় নিয়ম ও পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত গ্রাম বাংলার লোকজ খেলাধুলার পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে ১৫টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. অস্ত্র খেলা ২. লাঠি ও শক্তির খেলা ৩. আতস বাজির খেলা ৪. ঘুটির খেলা ৫. গুড্ডি খেলা ৬. চোখ বাধা খেলা ৭. কোটবন্দী খেলা, ৮. ছড়ার খেলা ৯. ধাধার খেলা,

১০ তাসের খেলা ১১. নাট্য ধর্মী খেলা ১২. পশু পাখীর খেলা, ১৩. পানির খেলা ১৪. ঘর কন্যা খেলা ১৫. প্রশ্নোত্তর খেলা ১৬. বর্ষাবরনের খেলা, এ সকল ভাগে অন্তর্ভূক্ত লোকজ খেলা সমুহ নিম্নরূপঃ

১. **অস্ত্র, লাঠিও শক্তির খেলাঃ** কাছি টানাটানি খেলা, কুস্তি খেলা, গাই গোদানী খেলা, ছ্যাল ছ্যালি খেলা, ঢেকি খেলা, নারিকেল খেলা, পালকি খেলা, বলী খেলা ও লাঠি খেলা।

২. আতস বাজির খেলাঃ চুঙ্গা খেলা।

৩. **কোট বন্দি ও ছকের খেলাঃ** এলাডিং বেলাডিং, গোল্লাছুট খেলা, চান্দা খেলা, ছিক্কা খেলা, চিওরানী খেলা, তুলিস ঢোল খেলা, দাড়িয়াবান্দা খেলা, নুনতা খেলা, পাখি শিকার খেলা, পোয়া পোয়া খেলা, বউরানী খেলা, বাঘবন্দি খেলা, বৌছি খেলা, রুমাল চুরি খেলা, হা-ডু-ডু খেলা।

৪. **গুটি বা ঘুটির খেলাঃ** কুত্তা খেলা, জোর-বেজোর খেলা, টুনি ভাইয়ের টুনি খেলা, পাশা খেলা ও বত্রিশ গুটির খেলা, ষোল গুটির খেলা, গুটি খেলা।

৫. **গুড্ডির খেলাঃ** গড্ডির খেলা বা ঘুড়ি উড়ানো খেলা।

৬ **ঘরকন্যা খেলাঃ** টোপাভাতি খেলা ও পুতুল খেলা।

৭. **চোখ বাধা খেলাঃ** কাঠি ছোয়াছুয়ি খেলা, কানামাছি খেলা, ফেচ্ছুয়া খেলা, পাতা চেনা খেলা, লুকুচুরি খেলা।

৮. **ছড়ার খেলাঃ** আগডুম বাগডুম খেলা, ইকড়ি মিকড়ি খেলা, চাডি খেলা, চোখের পাতায় দেয়া খেলা, পলানটুক টুক খেলা, চিমটি কাটা খেলা, ঢেকি ভানা খেলা, তেলের গাছ ঘুরানো খেলা, নাক টান খেলা, ফাদ-পাতা খেলা, হাটি হাটি পাপা খেলা।

৯. **তাস খেলাঃ** তাস খেলা।

১০. **ধাধার খেলাঃ** ধাধার খেলা।

১১. **নাট্য ধর্মী খেলাঃ** কইল্লা খেলা. কৈতরকাচা খেলা, চামড়ি খেলা, ছাগল ধরা খেলা, বাঘ বাঘ খেলা, পাতিতে ধান নেড়ে দেয়া খেলা, বুড়া-বুড়ির খেলা, রাজার কোটাল খেলা, সুদি-সুদি খেলা।

১২. **পশুপাখির খেলাঃ** কুমীর-কুমীর খেলা, গরু দৌড়ের খেলা, বাজিকর কবুতরের খেলা, বানরের খেলা, বেজীর খেলা, বুলবুলির খেলা, ভাল্লুক নাচন খেলা, মাকড়সার জাল খেলা, সাপের খেলা, ষাড়ের লড়াই খেলা ইত্যাদি।

১৩. **পানির খেলাঃ** আকুরমার টাকুর টুকুর খেলা, চিল ও হাস হাস খেলা, ছুল ছুল খেলা, নৌকা বাইচ খেলা, পানি ঝুক্কাখেলা, পলো খেলা, বাইছালী খেলা, মাছ ধরা খেলা, লাই বা জলই খেলা, সাঁতার খেলা।

১৪. **প্রশ্নোত্তর মুলক খেলাঃ** ঘু ঘু- সই খেলা, ঘুঙ্গির ঘুঙ্গির খেলা, ঘূর্ণ খেলা ন্যাইটা চড়ই খেলা, লুপ্তই খেলা, ব্যাঙের মাছ খেলা।

১৫. **বউ বরনের খেলাঃ** ঢোপ বাড়ি খেলা।

আলোচিত লৌকিক খেলাধূলা ব্যতীত বর্তমানে কিছু বিদেশী খেলা বা নাগরিক খেলা আমাদের গ্রামীন সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রামের অধিকাংশ লোককে এ সকল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। গ্রাম্য জীবনে প্রভাব বিস্তার করায় অধিকাংশ

লোকএ খেলায় অংশ গ্রহন করে বিধায় সকল নাগরিক খেলাও গ্রামীন খেলার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। যেমনঃ ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ভলিবল, নেটবল, বাস্কেট বল, ইত্যাদি।

এই আধুনিক খেলা সমূহ দেশজ খেলা নয় বিদেশাগত । তবু লক্ষ লক্ষ প্রামীন মানুষ ও নাগরিক এ খেলা সমূহে অংশ গ্রহন করে থাকে। এ সকল খেলা গ্রাম ও শহরে সমান জনপ্রিয়। অধুনা দেখা যায় গ্রামের যুব বয়সী ছেলেরা মাঠে এমন কি অনাবদী উঁচু নিম্ন জমিতে কখনও কখনও প্রশস্ত খালি রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে। বিদেশাগত এসব খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এতদসত্ত্বেও এ সকল খেলা লৌকিকত্ব অর্জন করতে পারেনি।

খেলার ইতিহাস যেমন অতি প্রাচীন ঠিক তেমনি বাংলার লোকজ খেলারও প্রাচীনত্ব রয়েছে। এর মধ্যে কোন খেলা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কোন খেলার রূপান্তর ঘটেছে আবার অনেক খেলা হারিয়েও গেছে। সংগ্রহের অভাবে বাংলার বহু খেলার ইতিহাস আজ অস্পষ্ট। অথচ খেলাধুলা বাদ দিয়ে বাংলার সস্কৃতি এবং বাঙ্গালী জীবন অসম্পূর্ণ। কারণ এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। খেলা থেকে পাওয়া যায় ইতিহাস, অর্থনীতি সমাজ ব্যবস্থা তথা সংস্কৃতি। তাই হারিয়ে যাওয়ার পথ থেকে যে সকল খেলাধুলা আজ ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশণ লোক কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন এর পাশাপাশি লোক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বিগত দুইদশক ধরে যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তার ফলশ্রুতিতে কিছু লোকজ খেলাধুলা ফাউন্ডেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব এর অনুষ্ঠানসূচীতে প্রায় প্রতিদিন লোকজ খেলার অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে লুপ্ত প্রায় চিত্তাকর্ষক দাড়িয়াবান্ধা, কইল্লা খেলা, উপেনটি বাইস্কোপ, টোকাটুকি খেলা, রুমাল চুরি খেলা, এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গি, দোক খেলা ও লাঠি খেলা।

তথ্য সংগ্রহ

১। লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব'৯৫ এর প্রতিবেদন ঃ সৈয়দ মাহবুব আলম।

২। বাঙ্গালীর খেলাধুলা– শংকর সেন গুপ্ত।

৩। সমাজ ও সমাজ তত্ত্ব – মোকাররম হোসেন।

৪। নরসিংদীর লৌকিক খেলাধুলা – মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান।

৫। বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য – আবদুল হামিদ।

৬। বাংলাদেশের গ্রামীন খেলাধুলা – শামীয়ূল আহম্মদ।

৭। বাংলার লোক সংস্কৃতি ঃ ডঃ ওয়াকিল আহম্মদ।

৮। উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি ঃ জাফর আহাম্মদ হানাফী।

লোকজ উৎসব ২০০১ এ মেলার সাজসজ্জা এবং ফাউন্ডেশনের নবনির্মিত স্থাপনা সমূহ

১। নবনির্মিত সীমানা প্রাচীর
২। নবনির্মিত কারুব্রীজ
৩। নির্মাণাধীন ডকুমেন্টেশন সেন্টার
৪। মেলার সুসজ্জিত কারুময় তোরণ
৫। পরিকল্পিত ফুলের বাগান
৬। ভবনের ব্যানার ও ফেস্টুন
৭। মেলার টাওয়ার
৮। লেকের মাঝে সুসজ্জিত ছোট দ্বীপ
৯। বাঁশের তৈরী গ্রামীণ সেতু
১০। হেলিপ্যাড
১১। গ্রামীণ খেলার মাঠ
১২। পুষ্পশোভিত গ্রীন হাউস (বাতায়ন)
১৩। বাংলাদেশের গাছপালা তরুমঞ্জরী
১৪। কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা
১৫। সুসজ্জিত (কারুপল্লী)
১৬। কারুপল্লীতে যাওয়া আসার কাঠের সেতু
১৭। বিশেষ প্রদর্শনীর প্যান্ডেল
১৮। মেলার স্টল
১৯। অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল
২০। সুসজ্জিত কারুমঞ্চ
২১। রেস্তোরা
২২। বিক্রয় কেন্দ্র
২৩। গ্রন্থাগার
২৪। সুসজ্জিত কারুব্রীজ (ছাউনিযুক্ত)
২৫। মেলার দেয়ালচিত্র (মুরাল)
২৬। নাগরদোলা
২৭। ময়ূরপঙ্খী নৌকা
২৮। সেমিনার হল
২৯। শ্লোগান খচিত ফেস্টুন
৩০। রঙীন পতাকা
৩১। পুকুর ঘাট
৩২। প্রধান ফটক
৩৩। কারুপল্লীর ফটক
৩৪। মেলার উদ্বোধনী ফেস্টুন
৩৫। গরুর গাড়ীর ভাস্কর্য
৩৬। বনবীথিকা